সূরা কাহফের লেন্স দিয়ে জীবন দেখা

হামিদা মুবাশ্বেরা

© Hamida Mubasshera

Disclaimer: এটি একটি অসম্পূর্ণ সিরিজ। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে একাধিক স্কলারের লেকচার ও তাফসীর অবলম্বনে দেয়া হামিদা মুবাশ্বেরার একটা লেকচার সিরিজের আলোকে। এটা অনুলিখনে সাহায্য করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বোন, আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। আর সম্পাদনা করেছেন হামিদা মুবাশ্বেরা নিজেই। ২০২০ সালের রামাদ্বান মাসে এটা Mubashera Sisters পেইজ থেকে প্রথমে **'রামাদ্বান কাটুক সূরা কাহফের সাথে'** এই শিরোনামে, পরে **'সূরা কাহফের লেন্স দিয়ে জীবন দেখা'** শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নানা ব্যস্ততার কারণে এটা শেষ করা হয় নি, ইনশাল্লাহ শেষ করা হবে একটু সুযোগ পেলেই। যেটুকু হয়েছে আপাতত সেটাই পিডিএফ আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। এটা কেউ চাইলে প্রিন্ট করতে পারেন, পরিচিতদের মাঝে শেয়ার করতে পারেন। তবে মাথায় রাখবেন এখানে কোনো শরীয়াহ সম্পাদনা করা হয় নি। তাই কোনো ভুল ত্রুটি বা গঠনমূলক সমালোচনার জন্য আমাদের পেইজে মেসেজ করতে পারেন।

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে আমরা, সমগ্র মানবজাতি এখন একটা অভাবনীয় কঠিন সময় পার করছি। আর কদিন পরেই আসছে আমাদের জীবনের সবচেয়ে অন্যরকম রামাদ্বান। হয়তো তারাবীহ পড়া হবে না, একসাথে সেহরী, ইফতার পড়া হবে না, এগুলো ভাবতেই আমাদের হয়তো অস্থির লাগছে। কিন্তু আমরা কি একবারো ভেবে দেখেছি যে রামাদ্বানের বিশেষত্ব যে কারণে সেটা যে আমাদের সাথেই আছে আর করোনা কোনোভাবেই সেটাকে কেড়ে নিতে পারবে না ইনশাল্লাহ?

কী সেটা?

আমি কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কের কথা বলছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটা একটা সমস্যা যে আমরা রামাদ্বানকে একদমই রোযার মাস, কুরআন 'খতম' দেয়ার মাস কিংবা তারাবীহ পড়ার মাস বানিয়ে ফেলেছি। কুরআন যখন আমাদের সাথে রামাদ্বান মাসকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, তখন তাকে কী হিসেবে অভিহিত করছে?
'কুরআন নাযিলের মাস' (২ঃ১৮৫)

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা যখন এটাকে কুরআন নাজিলের মাস হিসেবে দেখবো তখন করোনার সময়ে গৃহবন্দী আপনার আমার রামাদ্বান এক রকম হবে আর যখন আমরা এটাকে স্রেফ রোজার মাস/ তারাবীহ পড়ার মাস হিসেবে দেখবো তখন আরেক রকম হবে।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা হয়তো বা পরিষ্কার হবে। আমার কাছে অনেকে প্রশ্ন করেন, যে আমার নিফাস চলছে তাই আমি নামাজ পড়তে পারবো না কিংবা আমি প্রেগন্যান্ট/বাচ্চাকে দুধ

খাওয়াচ্ছি, রোজা রাখতে পারব না। এরকম অবস্থায় আমি তাহলে কি ধরনের ইবাদত করতে পারি? অথবা শবে কদরের সময় আমার পিরিয়ড চলবে, এ সময় আমি কি ধরনের ইবাদত করব?

আমি যখন এ প্রশ্নগুলো শুনি আমার কাছে যেটা মনে হয়, যে ইবাদতের ব্যাপারে আমাদের যে ধারণা, সেখানে এটা নেই যে আমি কোরআন পড়বো, বুঝবো, এটা নিয়ে চিন্তা করবো। এটা খুব দুঃখজনক একটা ব্যাপার কিন্তু। আমাদের চিন্তা ভাবনা ওখানেই আটকে যায় যে নামাজ পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে, দান খয়রাত করতে হবে। কিন্তু কোরান পড়তে হবে, বুঝতে হবে, কোরআন নিয়ে চিন্তা করতে হবে.....এগুলো মাথায় আসে না।

সম্ভবত সেইজন্যই আমাদের জীবনে কুরআন জীবন্ত না। আজকের মহামারী বা এমন সময়ে কুরআন থেকে নির্দেশনা খুঁজি না, খোঁজার কথা ভাবিও না!
তাই ইনশাল্লাহ মুবাশ্বেরা সিস্টার্স এর এবারের রামাদ্বানের আয়োজন **'রামাদ্বান কাটুক সূরা কাহফের সাথে'**
কেন সূরা কাহফ বেছে নিলাম?
অনেকগুলো কারণ।

প্রথমত, করোনার এই দুঃসময়ে হঠাৎ করেই যেন সোশ্যাল মিডিয়ায় দাজ্জাল, ইমাম মাহদী, কিয়ামাতের চিহ্ন এই টপিকগুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। এখন আমরা যদি সহীহ হাদীস থেকে দাজ্জালের ফিতনার ব্যাপারে নির্দেশনা পেতে চাই তাহলে প্রথমেই আসবে সূরা কাহফের কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
"যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহফের প্রথম দশ আয়াত (মুসলিমের হাদীসে এসেছে শেষ দশ আয়াত) মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিৎনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকবে"। [আবু দাউদঃ ৪৩২৩, আহমাদঃ ৬/৪৪৯]

তাই দাজ্জালের ফিতনার ব্যাপারটা আমরা সূরা কাহফের আলোকে বুঝার চেষ্টা করবো। আর এজন্য আমাদের মূল ফোকাস থাকবে প্রথম ১০ আয়াত।

দ্বিতীয়ত, সূরাহ কাহাফ হচ্ছে সেইসব দুর্লভ সূরাহ গুলোর একটি যেগুলোর ফযীলতের ব্যাপারে আমরা সহীহ হাদীস পাই। আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে আমাদের দেশে যেসব ওযীফা টাইপের বই আছে অথবা অনেক কুরআনের সাথে বিভিন্ন সূরাহের যেসব ফজিলত দেয়া থাকে যে এই সূরা পড়লে এই হয়,অমুক সূরাহ পড়লে তমুক হয় সেগুলোর অধিকাংশই ঠিক না। কারণ কোনো রেফারেন্স নেই, থাকলেও ভুয়া বা দুর্বল হাদীস। সূরা কাহফ সেটা না। হাদীস থেকে সূরা কাহফের একাধিক ফযীলাতের কথা আমরা জানতে পারি। একটা উপরে বললাম, আরো আছে। "যে কেউ জুমু'আর দিনে সূরাহ্ আল-কাহ্ফ পড়বে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত সে নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে"।

[মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৬৮, সুনান দারমী ২/৪৫৪]

"যেভাবে সূরাহ্ আল-কাহফ নাযিল হয়েছে সেভাবে কেউ তা পড়লে সেটা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর বা আলোকবর্তিকা হবে"।[মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৫৬৪]

তৃতীয়ত, আমরা অনেকেই জুমুআ বারে সূরা কাহফ তিলাওয়াতের আমলটা করি, কিন্তু সূরা কাহফের বিষয়বস্তু নিয়ে জানি না। অনেক সময় এই আমলটা হয়ে যায় যান্ত্রিক। আমি নিজেই এই দোষে দোষী। তাই আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকবে যেন এই সূরাটা শুধু একটা মন্ত্রের মত না পড়ে গিয়ে বুঝে পড়া ইনশাল্লাহ।

তবে আসুন এবারের রামাদ্বানটা কাটাই সূরা কাহফের সাথে?

কিভাবে তা করতে পারি?

- যদি ১ম এবং শেষ ১০ আয়াত মুখস্থ না থাকে, সেটা করে ফেলতে পারি।
- জুমুআ বারে পড়ার অভ্যাস না থাকলে সেটা শুরু করতে পারি।
- বিষয়বস্তু নিয়ে পড়াশোনা করতে পারি, আমাদের সিরিজটা ইনশাল্লাহ একটা সহায়ক ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাজ করবে।

১ম পর্ব

সূরা কাহফের পরিচয়ঃ কুরআনের ১৮ নাম্বার সূরা, আয়াত সংখ্যা ১১০, মাক্কী সূরা

জুমু'আ বারে সুরা কাহাফ পড়ে শেষ করার টিপসঃ

- আমরা আগের পর্বে দেখেছি যে জুমুআ বারে সূরা কাহফ পড়ার বিশেষ ফযীলাত রয়েছে। যেহেতু ১১০ আয়াতের সূরা এটা আমাদের অনেকের কাছেই কঠিন মনে হতে পারে। সেজন্য কয়েকটা টিপস-

ইসলামিকালি জুমাবার শুরু হয় বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর থেকে কারণ আমরা আসলে এ বারগুলো হিসাব করি লুনার ক্যালেন্ডার হিসেবে।তাই জুমাবার বলতে আমরা বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর থেকে শুরু হয়ে শুক্রবার মাগরিবের আগ পর্যন্ত এ টাইম/সময়টাকে বুঝি। তাই ১ম টিপস হল বৃহস্পতিবার মাগরিবের পরই বড় একটা অংশ পড়ে রাখা। যদি আপনি শুক্রবার এর জন্য এটা রেখে দেন, তখন দেখা যায় যে একটু এলোমেলো হয়ে যায়, পড়ে শেষ করা যায় না।

- দ্বিতীয়ত, এক বসাতে ১১০ আয়াত না পড়া, তাহলে প্রায়শই এটা সম্ভবপর হয় না। ভেঙ্গে ভেঙ্গে ১০-১৫ আয়াত করে পড়া।
- তৃতীয়ত, একদম প্রথম থেকেই পুরাটা পড়বো এভাবে না ভেবে অল্প অল্প করে শুরু করা। আমাদের নীতি হবে Fear Allah as much as possible। শুরু করেন ১০ আয়াত দিয়ে।তারপর এই ১০ আয়াত মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেলে এটাকে আরও এক্সটেন্ড করুন যে প্রথম ১০ আয়াত এবং শেষ ১০ আয়াত পড়বেন। দেখবেন একসময় পুরোটা পড়ার অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।
- চতুর্থত যেটা আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে গত দশ বছরে এই আমল যতবার মিস হয়েছে, সেটার কারণ ছিলো আমলটা করার ব্যাপারে আমি নিজের উপর ভরসা করেছি।অভ্যস্ততার কারণে ভেবেছি যে আরে পড়েই ফেলবো, সময় আছে এখনো, দেখা গেছে আসরের পরে পড়ার জন্য রেখে দিয়েছি। আর তখনই দেখা গেছে অপ্রত্যাশিত এমন কিছু ঘটে গেছে যে আমি এটা পড়ে আর শেষ করতে পারিনি। কিন্তু যখন দেখা গেছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছি, আল্লাহকে বলেছি যে আমি যেন এই শুক্রবার এ আমল টা করতে পারি, তখন দেখা যাচ্ছে

অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে গেলেও আমি সুরাটা পড়ে শেষ করতে পারছি। সুতরাং ইবাদত করার যে সক্ষমতা সেটাও কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

দাজ্জালের ফিতনার স্বরূপঃ

আমি মাত্র যখন ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি, তখন আমরা হাতে যে বইটা এসেছিলো সেটা ছিলো এই দাজ্জালের ফিতনা সংক্রান্ত একটা বই। সঙ্গত কারণেই বইটার নাম আর উল্লেখ করছি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে বইটাতে ছিলো একদম টানটান উত্তেজনা, পড়ে আমি একদম অবাক যে এভাবে দাজ্জাল চলে আসলো প্রায়, আর আমরা সেটা জানি ই না! বইটা পড়ে দাজ্জালের আগমনের ব্যাপারে আমি এতটাই চিন্তিত যে 'Illuminati Series' (যারা এটার কথা জানেন না, তারা আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন) এর আমি তখন একজন নিয়মিত দর্শক। ফেসবুকে সেটা জানানও দিয়ে বেড়াই। সাথে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বইটার প্রচার চালাই। এইসময় হঠাৎ করেই জানতে পারলাম যে বইটার অনুবাদকই এখন আর বইটাকে Endorse করেন না। শুনেতো আমি শোকে মুহ্যমান। ঘটনাক্রমে বইয়ের অনুবাদকের সাথে আমার সামনা সামনি সাক্ষাতের সুযোগ হল, ঊনি আমাকে এক কথায় বলে দিলেন যে বইটাতে লেখক সহীহ হাদীস নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করেছেন যা হাদীস শাস্ত্রের কিছু মূলনীতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। সাথে এটাও জানালেন যে আমি মারা যাওয়ার সাথে সাথে তো আমার কিয়ামত শুরু, দুনিয়াতে কবে কিয়ামত হবে সেটা দিয়ে আমার কী দরকার! কথাটা যেন আমার বুকের ভিতরে গিয়ে আঘাত করলো! সত্যিই তো! অনেক পরে আমি এই সংক্রান্ত একটা হাদীসও দেখেছিলাম যেটা ঊনার কথার সাথে একদমই সামঞ্জস্যপূর্ণ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-আমার উপর এ ওহী এসেছে যে, তোমাদেরকে ক্ববরে ফিতনায় ফেলা হবে। আর এ ফিতনাহ্ দাজ্জালের ফিতনার মতো হবে। নাসায়ী ২০৬২ (সহীহ হাদীস)

কাছাকাছি সময়েই ইসলামী জ্ঞানে অনেক সিনিয়র এক ভাই আমাকে শেখ সালমান আল আওদাহ এর একটি প্রবন্ধ পড়তে বললেন (যেটার অনুবাদ আমরা আমাদের পেইজ থেকে প্রকাশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ) আর বললেন যে হাতে সময় থাকলে Productive কিছু যেন করি, ঊনি নিশ্চিত যে আমি দ্বীনের ব্যাসিক কিছুই জানি না। খুব আঁতে লাগলো।

শুরু হল আমার দ্বীনের ব্যাসিক জানার যাত্রা। এই যাত্রায় দাজ্জালের আগমন নিয়ে সকল ফ্যান্টাসি আমার কেটে গেছে আলহামদুলিল্লাহ যখন আমি নিচের হাদীস থেকে বুঝেছি যে দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও বড় ফিতনার সম্মুখীন আমাকে প্রতিদিন হতে হয়-

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিব না, যে বিষয়টি আমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের চাইতেও ভয়ঙ্কর? সাহাবীগণ বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তা হচ্ছে গোপন শিরক। (এর উদাহরণ হলো) একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার সালাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার সালাত দেখছে। (ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

তবে তারপরও একটা প্রশ্ন আমার মনের ভিতর খচখচ করতো খুব যখন আমি প্রথম নিচের হাদীসটা পড়েছিলাম-
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে (নিম্নে বর্ণিত) এই দু'আটি কুরআনের সূরা যেরূপ শিক্ষা দিতেন সেরূপ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে, জীবিত এবং মৃতের ফিতনা হতে আপনার আশ্রয় নিচ্ছি। (সহীহ, মুসলিম ৫৮৮)

আমার মনে হত যে আমার জীবদ্দশায় যদি দাজ্জাল নাই আসে তাহলে আমি দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাবো কেন। এটা আমাকে খুব ভাবাতে লাগলো।

২য় পর্ব

আমার জীবদ্দশায় যদি দাজ্জাল নাই আসে তাহলে আমি দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাবো এই প্রশ্নের উত্তর আমি আলহামদুলিল্লাহ কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম সূরা ফাতিহার তাফসীর পড়তে গিয়ে । সূরা ফাতিহাতে যখন আমরা বলি যে غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

তখন সেটার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাদীস এসেছে যে মাগদূবী আলাইহিম (যাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ) বলতে ইহুদিদের এবং আদ দাল্লীন (যারা পথভ্রষ্ট) বলতে খ্রিস্টানদের বোঝানো হচ্ছে। এটাকে যদি আমরা আক্ষরিক অর্থ নেই তাহলে মনে হবে যে মুসলিম হিসেবে জন্ম নিলেই বুঝি জান্নাতে যাওয়ার টিকেট নিশ্চিত, বাকী সব ধর্মের সব অনুসারীরাই নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে আমরা বুঝবো যে এখানে আমি আসলে ব্যক্তি ক্রিস্টান বা ব্যক্তি ইহুদীদের

থেকে আশ্রয় চাইছি না, আমি মূলত আশ্রয় চাচ্ছি ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের দুটো চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য থেকে।

ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল সেটা দিয়ে তারা সত্যকে চিনতে পারার পরেও সেটার উপর আমল করত না। ওরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী। কিন্তু ওরা তাকে অস্বীকার করেছিলো কারণ ঊনি ওদের গোত্র তথা বনী ইসরাইল থেকে ছিলেন না। তাই কুরআন যে ভঙ্গিতে বনি ইসরাইলদের সম্বোধন করছে সেই ভঙ্গিটাটা খুব আবেগময় যেমন তোমরা আল্লাহর বাণীর প্রাথমিক অস্বীকারকারী হইও না (২ঃ৪১) কিংবা তোমরা এই নবীকে চিনো যেভাবে নিজের পুত্রকে চিনো (২ঃ১৪৬)। নিজের বাচ্চাকে চিনতে যেমন কোন ভুল হয় না সেরকম ।কি অসাধারণ একটা তুলনা। আবার সূরা জুমুআতে ইহুদিদের বলা হয়েছে যে ভারবাহী গাধার মত, মানে ওদের পিঠে অনেক জ্ঞান কিন্তু গাধা যেমন তার পিঠে যতই এনসাইক্লোপিডিয়া থাকুক সেটা কোন কাজে আসে না, গাধা কিছুই জানেনা আল্লাহ ইহুদিদের সেরকম তুলনা করেছেন। এখন এটা কিন্তু খুব ভীতিকর একটা ব্যাপার। তাই আমি এই দোয়াটা নিজের জন্য সব সময় করি যে আমার আইওইউএর জ্ঞান এবং অন্যান্য যে জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আমাকে দিয়েছেন সেটা যেন ভারবাহী গাধার মতন না হয়। এই দোয়াটা আমাদের সবার করা উচিত।

ইহুদিদের দ্বিতীয় আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা হচ্ছে ওরা খুব বেশি ফিকহ, মাসআলা মাসায়েল নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, মানে দ্বীনের বাহ্যিক কাঠামোটাই ওদের কাছে সর্বস্ব হয়ে গিয়েছিলো। আজকের সময়ে মুসলিমদের মাঝে এটার উদাহরণ চিন্তা করলে আমার বুকটা ভেঙ্গে যায়। চিন্তা করুন করোনার সময়ে এই মাসজিদ বন্ধ করা নিয়ে কী তামাশাটাই আমাদের দেশে হল। পাকিস্তানেও দেখলাম যে আলিম সমাজ নাকি একমত হয়ে মসজিদ খুলে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন। আমি ঊনাদের ব্যাপারে কোনো অসম্মানজনক মন্তব্য করতে চাই না কিন্তু আমার খালি মনে হয় যে আমাদের দ্বীনের বুঝ কতটা ফাঁপা হলে আমরা এই সামান্য জিনিসটা বুঝতে পারছি না যে আল্লাহর কাছ থেকে এই মহামারী থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য মাসজিদে গিয়ে দুআ করা জরুরী না। এই মহামারীর চেয়ে আরো অনেক সামান্য কারণে যেখানে (অসুস্থতা, সফর ইত্যাদি) জামাতের সালাত এবং জুমুআর নামাযের বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা জায়িজ আছে সেখানে এই ভয়ংকর সময়ে যেখানে আমি জামাতে যাওয়ার মাধ্যমে অন্যকে সংক্রমিত করতে পারি তখন মাসজিদে জামাত ও জুমুআ স্থগিতের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিলো আলিমদের ব্যাসিক কমন সেন্স এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল অনেক মানুষ আছেন

যারা করোনায় আক্রান্ত কিন্তু কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না, তারা নিজেদের সুস্থ ভেবে মাসজিদে যেয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন মানুষদের মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিতে পারেন। ফিকহের ব্যাসিক একটা উসূল হচ্ছে ক্ষতি প্রতিরোধ করা কোনো কল্যাণ আনয়নের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। এভাবে চিন্তা করলেও তো এ ব্যাপারে কোনো কনফিউশন থাকার কথা না।

খ্রিস্টানদের যে বৈশিষ্ট্য থেকে আমি আশ্রয় চাই সেটা হল জ্ঞান অর্জন করার আগ্রহ না থাকা এবং যুক্তি বুদ্ধির পাশ কাটিয়ে স্রেফ আবেগ দ্বারা জীবনের ক্রিটিক্যাল সিদ্ধান্ত নেয়া। আপনারা দেখবেন যে ত্রিত্ববাদ এর মত একটা ধারণা , যেখানে আল্লাহ একের ভিতর তিন, এটা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে আবেদন সৃষ্টি করার কথা না। কিন্তু তারপরও এটা এত জনপ্রিয় কেন? কারণ হচ্ছে এটা আমাদের জীবনকে খুব সহজ করে দেয়। যীশু আমার পাপের জন্য ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছে, আমি যদি এটা বিশ্বাস করি তবে আমি যাই করি না কেন স্বর্গে যাব। এটা যেন একটা বিনামূল্যে টিকেট যা ইচ্ছা তাই করার। জ্ঞান অর্জনের প্রতি অনীহা থেকেই কিন্তু ওরা এই অদ্ভুত বিশ্বাস নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এই জিনিস কি আমাদের মধ্যে নেই? এই জিনিসটা করোনার চেয়ে মারাত্মকভাবে আমাদের মধ্যে আছে। মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত একটা ধারণা আছে যে যত বেশি জানবো ততো বেশি বাধ্যবাধকতা আসবে, তাই অল্প জানা ভালো। আমরা এখানে ভুলে যাচ্ছি যে আমরা আল্লাহ তা'আলাকে বোকা বানাতে পারি না। আমি যদি আমার সামনে জ্ঞান অর্জন এর রাস্তা খোলা থাকা সত্বেও জ্ঞান অর্জন না করি তাহলে ওই চেষ্টা না করার জন্য আমরা দায়ী হব। আমরা এই যে আজকের এই কঠিন ক্রান্তিলগ্নে মাসজিদ খোলা রাখতে চাইছি, আপনি দেখবেন যে এখানে সব যুক্তিগুলো আবেগীয় কথাবার্তা। মসজিদ আল্লাহর ঘর, এখানে আসলে আপনার কিছু হবে না, এখানে ফেরেশতা থাকে ইত্যাদি। কথা শুনলে মনে হবে যে ফেরেশতা শুধু বুঝি মাসজিদেই থাকে। এই যে বাজারে তো লোক যাচ্ছে তাইলে মসজিদে লোক যেতে কী সমস্যা অথবা এই যা একটা জানাযায় ইসলামিক মানুষদের আহবানেই লাখ লাখ লোক সমবেত করা হল, এটা থেকে বুঝা যায় যে ক্রিস্টানদের এই বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে কী পরিমাণ সংক্রমিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন!

আমার জীবদ্দশায় ব্যক্তি দাজ্জাল না আসলেও আমি যে তার অথবা তার চেয়েও বড় ফিতনাতে পড়ে যেতে পারি, সেটা বোঝার জন্য উপরের উপলব্ধি আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে ব্যক্তি দাজ্জাল আমাদের জীবদ্দশায় না আসলেও দাজ্জালের ফিতনা একটা আইডিয়া যেটা নানা রূপে আমাদের জীবনে আসতে পারে।যেমন ধরুন, নিচের হাদীসে বলা হয়েছে যে-

কিয়ামতের আগ দিয়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপর্যয় আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতি অগ্রসর হও। ঐ সময় যে ব্যক্তি সকাল বেলায় মু'মিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় মু'মিন থাকবে সে সকালে কাফির হয়ে যাবে। মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে তার ধর্ম বিক্রয় করে দিবে। সহীহ্, সহীহাহ (৭৫৮), মুসলিম।

আমি এই ব্যাপারটা প্রচণ্ড ভয় পাই এবং এই হাদীস উল্লেখ করে এদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যদিও বা কিয়ামত কবে হবে এটা নিয়ে আমি একেবারেই চিন্তিত নই।

একইরকম ভাবে দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসগুলো পড়লে আমরা দেখবো যে দাজ্জাল অধিকাংশ মানুষকে মূলত চারটি বিষয়ে ফিতনায় ফেলে তার প্রতি প্রলুব্ধ করবে এবং তার অনুসারী বানিয়ে ফেলবে। এই চারটি বিষয় হচ্ছে-

1. ঈমানের উপর পরীক্ষা
2. সম্পদের উপর পরীক্ষা
3. জ্ঞানের উপর পরীক্ষা
4. ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা

তাই আমি যদি দাজ্জালের আগমনের সময় বেঁচে নাও থাকি তবুও এটা হতে পারে যে দাজ্জাল আমাকে যে জিনিসগুলো দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইবে, সেই জিনিস গুলোর যেকোনো একটা বা একাধিকে পরে আমি ঈমানহারা হয়ে মারা যাচ্ছি। আল্লাহ মাফ করুন। সুতরাং দাজ্জালের ফিতনা থেকে আমি আশ্রয় চাই এটার ব্যাপ্তি অনেক বিশাল। যখন আমি দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, তখন আমি প্রকারান্তরে আশ্রয় চাচ্ছি যে আল্লাহ আমার ঈমানের ওপর যেন কোন পরীক্ষা না আসে, ঐশ্বর্য বা দারিদ্র যেন আমার ঈমানহারা হওয়ার কারণ না হয়, আমার জ্ঞান অথবা জ্ঞানহীনতা যেন আমার ঈমানহারা হওয়ার কারণ না হয়, আমার ক্ষমতা থাকা অথবা ক্ষমতা না থাকা যেন আমার ঈমান হারানোর কারণ না হয়। সূরা কাহফের বিষয়বস্তু বুঝতে হলে এই জিনিসটা বোঝা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৩য় পর্ব

দাজ্জালের ফিতনার সাথে সূরা কাহফের সম্পর্কঃ

এটা নিয়ে কথা বলার আগে বলে রাখতে চাই যে যখন একটা সূরার কোন নির্দিষ্ট ফযীলাত থাকে তখন সেই সূরার বিষয়বস্তুর সাথে সেই ফযীলাতের গভীর সম্পর্ক থাকে। তাই আপনি যদি সূরার বিষয়বস্তু না জানেন তাহলে ফযীলাতটা পুরোপুরি পাবেন না।

একটু উদাহরণ দেই। আপনারা জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ থাকতেন অথবা উনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হতেন অথবা রুকইয়া হিসেবে জ্বীন, বদ নজর, যাদু টোনা এগুলো থেকে মুক্তির জন্য তিন ক্বুল (নাস, ফাল্াক, ইখলাস) পড়ে ফুঁ দিতেন, অথবা পানিতে ফুঁ দিয়ে খেতেন। এগুলো অনেক উপকারী, শরিয়াসম্মত আমল।

কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে কেন নাস ফালাক ইখলাস? কেন এটা সূরা লাহাব না? বা সূরা নাসর না বা সূরা কাওসার না? এই জিনিসটা যদি আমরা না বুঝি, আর অন্ধের মত পড়ে ফুঁ দেই বা খাই, তাহলে কখনোই শতভাগ ফল পাবোনা। কিছু উপকার তো অবশ্যই থাকবে কারণ এটা আল্লাহর কালাম কিন্তু কখনোই পুরাটা না। আমার নিজস্ব একটা পর্যালোচনা আছে যে কুরআনের রুকিয়ার আয়াতগুলোর অর্থ খেয়াল করলে আমরা দেখবো যে এগুলো হয় আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানাচ্ছে নাহয় জ্বীন জাতির প্রকৃত সত্য আমাদের সামনে তুলে ধরছে। যারা বদ নজর বা যাদুটোনা নিজেরা করে বা এর শিকার হয় তারা জানে না যে জ্বীনরা কত অসহায়। অথবা তারা আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানেনা অথবা আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান অথবা তাদের ধৈর্য্য নাই। আমরা যদি রুকিয়ার আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করি, আল্লাহর বৈশিষ্ট্য গুলো নিয়ে চিন্তা করি, যেই মানুষ জ্বীন জাতির আসল কাহিনী জানে- তাদের দুর্বলতা তাদের সীমাবদ্ধতা, এবং আল্লাহর কুদরতের ব্যাপারে জানে তার রুকিয়ার প্রভাব অনেক অনেক বেশী হবে তার চাইতে যে জানে না।

একটা লেকচারে এ ব্যাপারটা সুন্দর একটা উপমা দিয়ে বুঝানো হয়েছিলো। ধরুন আপনি জানেন যে আপনি শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত, নিজেকে রক্ষা করার জন্য আপনার অস্ত্র দরকার। দাজ্জালের

ফিতনা থেকে বাঁচতে সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্ত থাকা আপনার সেই অস্ত্র। কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনার কাছে তীর ধনুক আছে কিন্তু আপনি জানেন না কোন দিকে সেটা তাক করতে হবে। কারণ আপনার শত্রু কে এটা আপনি জানেন না। তাহলে দেখা যাবে সূরা কাহফ মুখস্ত থাকা সত্ত্বেও আপনি হয়তো ফেল করে যাবেন সম্পদের বা জ্ঞানের বা ঈমানের বা ক্ষমতার পরীক্ষায়। সূরা কাহফের বিষয় বস্তু জানা কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে?

সূরা কাহফে আল্লাহ আমাদেরকে চারটি কাহিনী জানাচ্ছেন যেগুলো আসলে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার স্বরূপ আমাদের সামনে উন্মোচন করছে।

১। গুহাবাসীর গল্প যারা তাদের জীবদ্দশায় ঈমানের পরীক্ষায় পড়েছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন।
২। এক বিত্তশালী ব্যক্তির গল্প যে পড়েছিলো সম্পদের পরীক্ষায় এবং হেরে গিয়েছিলো।
৩। মুসা (আ) এবং খিদির (আ) মাঝে কথাপকথোনের গল্প যেখানে আবার তিনটা শাখা গল্প আছে। সবগুলো গল্পই গায়েবের জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। মুসা আলাইহিস সালাম এখানে জ্ঞানের পরীক্ষায় পড়েছিলেন।
৪। জুলকারনাইনের গল্প যিনি ছিলেন একজন চরম ক্ষমতাধর ব্যক্তি, অর্ধেক পৃথিবী তার ক্ষমতাধীন ছিল।উনি ক্ষমতার পরীক্ষায় জিতে গিয়েছিলেন।

আমরা এই গল্পগুলোর সারমর্ম আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ, তবে বিস্তারিত যাবো না, আমাদের ফোকাস থাকবে এগুলো কিভাবে দাজ্জালের ফিতনা ধরতে আমাদের সাহায্য করবে এবং কিভাবে প্রথম ১০ আয়াত আমাদেরকে এটার ব্যাপারে নির্দিষ্ট বার্তা দিচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিলো নিজেদের ধর্মগ্রন্থ না বুঝে পড়া। আমরা যখন সূরা কাহফের বিষয়বস্তু নিয়ে জানছি তখন ওদের এই বৈশিষ্ট্য থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ। ফলে সূরা ফাতিহার উপর আমল করছি। এই রামাদ্বানে শুরু হোক এমন ইবাদাত করা যেটা হয়তো আগে আমরা জীবনে কখনোই করিনি, সেটা হচ্ছে কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা তাদাব্বুর আল কুরআন।

কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণার সেই গভীর আনন্দময় জগতে আপনাকে স্বাগতম!

৪র্থ পর্ব

সূরা কাহফ নাযিলের পটভূমিঃ

আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনার খোরাক যোগানো, তাই সূরা কাহফের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা এটা কখন, কোন প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে সেটা একটু দেখবো।

সূরা কাহাফ একটি মাক্কী সূরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করা শুরু করলেন তখন ঊনাকে প্রতিহত করা কুরাইশদের জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছিল। ওরা তখন মদিনার ইহুদিদের কাছে গেল সাহায্য চাইতে। তখন মদিনার ইহুদিরা বলল তোমরা ওনাকে গিয়ে তিনটা বিষয়ে জানতে চাও। সে যদি এই তিনটা ব্যাপারে ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে তাহলে সে হচ্ছে সত্য নবী। আর উত্তর দিতে না পারলে কেল্লা ফতে, তোমরা প্রমাণ করতে পারবে যে তার দাবী মিথ্যা। বিষয়গুলো ছিলো-

প্রথমত, গুহাবাসীদের ব্যাপারে

দ্বিতীয়ত, রূহ এর ব্যাপারে

তৃতীয়ত, যুলকারনাইনের ব্যাপারে।

কুরাইশরা সেই মত কাজ করলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে জানতে চাইলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঠিক আছে আমি কালকে এর উত্তর দিব। অবশ্যই উনি আশা করছিলেন এই বিষয়ে ওহী আসবে এবং তার পরে উনি উত্তর দিবেন। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো।

কিন্তু কী হলো?

বেশ কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ থাকলো। কয়দিন সেটা আমরা এক্স্যাক্টলি জানি না, তবে বেশ কিছুদিন এটা নিশ্চিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন কারণ প্রশ্নকর্তারা এটা নিয়ে হাসাহাসি করছে যে উনি উত্তর জানেন না বা কিছু।

বেশ কিছুদিন পর আবার ওহী আসা শুরু হল। এই ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ সূরা কাহফের ২৩ নাম্বার আয়াত নাযিল করলেন- "আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে সেটা আগামীকাল করব ইনশাল্লাহ বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন.....অর্থ্যাৎ এই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত ছিলেন যে পরের দিনই ওহী আসবে, সেটা ঠিক হয় নি, সেটা জানিয়ে দিলেন।

আমরা যে ভবিষ্যতের কিছুতে ইনশাআল্লাহ বলি, সেটার কুরআনিক রেফারেন্স হচ্ছে এটা।

যাই হোক, তারপর আস্তে আস্তে আল্লাহ ওদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন।

গুহাবাসীর ব্যাপারে আমাদের জানালেন সূরা কাহফের ৯-২৬ নং আয়াতে।

যুলকারনাইনের উত্তর দিলেন সূরা কাহাফের ৮৩-৯৯ নং আয়াতে

রূহের ব্যাপারে জানালেন সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫ নং আয়াতে, যেটা হচ্ছে ১৭ নম্বর সূরা।

এখন এই জায়গাটায় এসে দুইটা বিশাল চিন্তার খোরাক আছে।

প্রথমত, আমরা আগে বলেছি যে ইহুদিরা জানত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী। তাহলে ওরা এই ঝুঁকি কেন নিল ,যে ওরা এরকম তিনটা প্রশ্ন মক্কার কুরাইশদের করতে পাঠালো?

এই ক্ষেত্রে উনি যদি সত্যি উত্তর দেন তাহলেতো এটা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে।

কেন এই তিনটা প্রশ্নই? কেন অন্য প্রশ্ন নয়?

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ কেন সাথে সাথেই ওহী নাযিল করে উত্তর দিলেন না?

আমরা আপনাকে একটা ক্লু দিবো, আপনারা চিন্তা করবেন প্লিজ, দয়া করে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো অর্থ সহ পড়ে নিবেন। আমরা আগামী পর্বে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করবো ইনশাল্লাহ।

আমাদের জানা দরকার যে আসহাবে কাহাফ বা গুহাবাসীর ব্যাপারটা ছিলো ক্রিস্টানদের জন্য খুব বিশিষ্ট একটা ঘটনা। Seven Sleepers ওদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি, সাধু টাইপ। তবে এটা নিয়ে ওদের মাঝে অনেক বিতর্ক ছিল। উনারা কারা ছিলো, তাদের কী হয়েছিল, কোথায় হয়েছিল, কোন রাজা থেকে পালানোর জন্য ওরা গুহাতে লুকিয়ে ছিল, কোন রাজার সময়ে আবার জীবিত হয়েছিলো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা ছিলো।

ঠিক একইভাবে রুহ কী, সেটার সাথে নাফসের পার্থক্য , কেয়ামতের দিন আল্লাহ যখন আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন তখন শুধু শরীর করবেন নাকি রূহসহ করবেন ,জাহান্নাম বা কবরের আজাব শুধু শরীরের হবে নাকি রূহেরও হবে এগুলো নিয়ে খ্রিস্টীয় ধর্মে তখন অনেক মতপার্থক্য চলছিল।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যুলকারনাইনের ব্যাপারেটাও এমনই ছিলো। সে কে, কোথায় ছিল, কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলো এইসব ব্যাপারেও অনেক ধরনের মতবাদ প্রচলিত ছিল।

তাহলে আমাদের মূল ক্লু হচ্ছে যে ওরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলো যেগুলোর ব্যাপারে একাধিক মতবাদ বিরাজমান ছিলো। আসুন একটু চিন্তা করি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে 🙂

৫ম পর্ব

গত পর্বে আমাদের জিজ্ঞাস্য ছিলো যে ইহুদীরা এই তিনটি প্রশ্নই করেছিলো কেন, অন্য কোনো প্রশ্ন নয় কেন।

একটু চিন্তা করলে বুঝবো যে ওরা বিতর্ক আছে এমন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছিলো যেন একটা Escape Route থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন নির্দিষ্ট উত্তর বলেন, তাহলে তারা বলবে না না তুমি সঠিক উত্তর দাওনি। ওরা আসলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোকা বানাতে চাচ্ছিলো। যদি উনি উত্তর বলেন যে A, তাহলে তারা বলবে B হচ্ছে সঠিক। যদি B উত্তর দেয়, তারা বলবে C সঠিক,C উত্তর দিলে বলবে D সঠিক।

তাছাড়া এই পুরো প্রশ্ন করার ব্যাপারটার মধ্যে ওদের আরো একটা কৌশল কাজ করেছিলো, ওরা নিজেদেরকে Commanding position এ নিয়ে গিয়েছিলো।

একটা উদাহরণ দিলে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ধরুন কোনো টিভি চ্যানেলে পহেলা বৈশাখের প্রাক্কালে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক'- এই মর্মে কোনো টকশো আয়োজন করা হল। এক ধরণের ব্যালেন্স রক্ষার জন্য সেখানে কোনো আলেমকে আনা হল বক্তা হিসেবে। বাস্তবতা হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই সেক্যুলার চিন্তাধারার মানুষদের আধিক্য থাকে, তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে মঙ্গল শোভাযাত্রার কন্সপেটের সাথে ইসলামের কোনো সমস্যা নেই। তখন আপনি খেয়াল করবেন যে সেক্যুলার ব্যক্তিত্বকে অনেক বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে বা উনি তার অবস্থান বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাচ্ছেন। অন্যদিকে যিনি ইসলামিক মেন্টালিটির তার কথার মাঝে বারবার বাঁধা দেয়া হচ্ছে অথবা তাকে উত্তর শেষ করতে দেওয়া হচ্ছেনা।

শুধু মিডিয়াই না আমরা নিজেরাও অনেক সময় পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই কিন্তু। হঠাত দেখবেন একজন মুরুব্বী আপনাকে বলবেন অহে নব্য হুজুর, খুব তো আজকাল ইসলাম পালন করছিস, বল তো ইসলামে হিজাব কেন ফরয, মেয়েদেরকে অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া হয় কেন ইত্যাকার নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হচ্ছে। আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন আপনি হয়তো প্রথমে হিজাব কেন ফরয এটার উত্তর দিয়েছেন এভাবে ৬-৭টা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তারপর ঘুরে ফিরে আপনাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল পর্দা কেন ফরয।

কিন্তু কেন এমনটা হচ্ছে?

আমাদেরকে এই সেটিংটার একটা বৈশিষ্ট্য খেয়াল করতে হবে।

অধিকাংশ সময়ে এখানে কিছু জানার বা বোঝার জন্য প্রশ্ন করা হয় না, মূলত প্রশ্ন করা হয় অন্য পক্ষকে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিন্তা করে ঘায়েল/ কোনঠাসা করার জন্য। একের পর এক প্রশ্ন করে

প্রশ্নকর্তা এমন একটা আবহ তৈরি করেন যে প্রশ্নকর্তাই বেশি জানেন, Flow of discussion সেই নিয়ন্ত্রণ করে। তারা ঠিক করে যে কোন বক্তাকে কতটুকু সময় দিবে।

ইহুদী এবং কুরাইশরা এখানে ঠিক সেই কাজটাই করেছে, তারা প্রশ্নকর্তা হয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যে তারা বেশী জানে, তারা ঠিক করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক উত্তর দিচ্ছেন নাকি ভুল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ওদের এই দুটো সাইকোলজিকেই (ভিন্ন মত আছে এমন প্রশ্ন করে Escape Route রাখা এবং Commanding ফর্মে থাকা) খুব সুন্দর ভাবে Tackle দিয়েছেন।

কিভাবে?

প্রথমত, আল্লাহ ওদেরকে Ignore করলেন সাথে সাথে উত্তর না দিয়ে। ধরুন,আপনার প্রফেসর বা বস আপনাকে কিছু জানতে চেয়ে ইমেইল করলো।এটার তো প্রশ্নই উঠে না আপনি ১০ দিন তার ইমেইলের রিপ্লাই দিবেন না।কারণ সে আপনার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু আপনার বসের পরিবর্তে যদি কোন জুনিয়র বা এমন কেউ নক দেয় যাকে আপনি তেমন একটা পাত্তা দেন না,তার ক্ষেত্রে আপনি হয়তো পরে, কোনো একসময়, আপনার সুবিধা মত সময়ে উত্তর দিতেন। এর মাঝে যদি সেই জুনিয়র চিন্তা করে আপনি আসলে প্রশ্নের উত্তরটা জানেন না আপনি কিন্তু সেটাও পাত্তা দিবেন না কারণ আপনি তাকে গোণায় ধরেন না, সে আপনার সম্পর্কে কী ভাবলো বা না ভাবলো তা আপনার কাছে কোন ব্যাপারই না।সোজা ভাবে বললে, আপনার মনোভাবটা হবে "I don't care."
ঠিক একই মনোভাব দেখা যাচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে। আল্লাহ প্রশ্নকর্তাদের ইগনোর করছেন সাথে সাথেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে।এই সময়ে যখন তারা মনে করছিলো আল্লাহর রাসূল সম্ভবত জানেন না,তিনি হয়তো সত্য নবী না,ভণ্ড, তখনও আল্লাহ কোন ওহী নাজিল করেননি।কেন?কারণ Allah doesn't care। উল্টো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সূরা কাহফের ৬ নং আয়াতেই হাল্কা তিরষ্কার করলেন যে কেন তিনি এতো চিন্তিত হচ্ছিলেন এই ভেবে যে ওহী আসছে না কেন। আল্লাহ এ সূরার ৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেনঃ
"অতঃপর তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে তুমি দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ছাড়বে।"
দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ওদের করা রুহ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জানালেন,
তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলে দিনঃ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

অর্থ্যাৎ আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ব্যাপারে কোনো উত্তরই দিচ্ছেন না। তিনি বলছেন প্রশ্নকর্তা নিজে এবং যাকে সে প্রশ্ন করছে তাদের দুজনের জানাশোনা একই পর্যায়ে।এমন না যে যারা প্রশ্ন করেছে তারা রুহ নিয়ে জেনে বসে আছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করছে তিনি কতটা জানেন।বরং দুপক্ষই একই অবস্থানে রয়েছে। ব্যাপারটা এমন যেন আমি আমার প্রফেসরকে ঘায়েল করার জন্য কিছু জিজ্ঞেস করলাম আর ঊনি উত্তরে বললেন যে এটা বুঝার মত ঘিলু আমার মাথায় নাই বা এটার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই!

তৃতীয়ত, গুহাবাসী বা যুল্কারনাইনকে নিয়ে যেসব বিষয়ে মতভেদ ছিলো সেগুলো ঊনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে ফোকাস করেছেন মূল বিষয় অর্থ্যাৎ এই দুই ঘটনা থেকে শিক্ষা।

আপনারা যদি কষ্ট করে গুহাবাসীদের কাহিনী এই সূরার ৯-২৬ আয়াতে পড়েন দেখবে যে তারা কয়জন ছিল, গুহাটা কোথায় ছিল, তারা কতদিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, এই জিনিসগুলো নিয়ে কুরআন কিছুই বলছে না। বরং এসব অপ্রয়োজনীয় ইস্যু বাদ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই গল্প বা ঘটনার আসল শিক্ষার উপর ফোকাস করেছেন, সেই সাথে খ্রিস্টানরা এই ঘটনার যে বিকৃতি সাধন করেছিলো সেটার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

একইভাবে যুলকারনাইনের কাহিনী শুরু হচ্ছে ৮৩ নাম্বার আয়াত থেকে আর শেষ হচ্ছে ৯৯ আয়াতে গিয়ে। কে ছিল এই জুলকারনাইন, কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলো এগুলোও কুরআন

কিছুই বলছে না, বলছে উনি ক্ষমতার পরীক্ষায় কিভাবে পাশ করে গিয়েছিলেন, তাঁর অধীনস্থদের সাথে কীভাবে আচরণ করেছিলেন ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইভাবে সূরা কাহফ নাযিলের কাহিনী বিশ্লেষণ করে আমাদের লাভ কী? এভাবে কি কুরআন আমাদের জীবনে জীবন্ত হবে একটু ইনশাল্লাহ? আমরা কি বুঝলাম যে আল্লাহ আমাদেরকে একটা কৌশল শিখালেন? কিভাবে উলটা প্রশ্নকর্তার ভূমিকায় গিয়ে যে কোনো কথোপকথনে Commanding পজিশন নিতে হয়? আমাদের বুঝালেন যে প্রতিপক্ষের অবস্থা বোঝার মত দূরদর্শিতা আমাদের থাকতে হবে।

বর্তমান পৃথিবীর দুইটি অবস্থার ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। একটা হচ্ছে কিছু মানুষ আছে যারা আসলেই জানতে ইচ্ছুক, তারা প্রশ্ন করবে, সেটা বুঝে আমাদের বিস্তারিত উত্তর দিতে হবে তাদেরকে। আবার আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে আমরা একটা বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের (intellectual war) মধ্যে আছি। ইসলামকে যারা প্রশ্নের সম্মুখীন করে তাদের উদ্দেশ্য সব সময় বিশুদ্ধ না। এরকম অনেক দালাল আছে যারা প্রশ্নই করে মুসলিমদের মনোবল দুর্বল করে দেওয়ার জন্য।

আমাদের অবশ্যই সুধারণা করতে হবে যে প্রশ্নকর্তা যা জানতে চাচ্ছে তা আগ্রহ থেকেই চাচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় পরিস্থিতির ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করার যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে, কোনোভাবেই ব্যক্তিগত আক্রমণে যাওয়া যাবেনা।

কুরআন থেকেই আমরা পেতে পারি সঠিক দিকনির্দেশনা, এই বুদ্ধির লড়াই আমরা জিততে পারি।

৬ষ্ঠ পর্ব

আজকের পর্ব থেকে আমরা সূরা কাহফে উল্লেখিত চারটা গল্পের সারমর্ম বলা শুরু করবো ইনশাল্লাহ। আমরা আমাদের পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের উদ্দেশ্য দাজ্জালের ফিতনা থেকে সূরা কাহফ কিভাবে সাহায্য করবে সেটা বোঝা, তাই আমরা এই কাহিনীগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাবো না। আমাদের এই সারমর্ম আলোচনা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন আমরা নিজেরা সূরাটা অর্থসহ পড়ে নিবো।

এখানে উল্লেখ্য যে আজকে থেকে আমাদের যে আলোচনা, সেটার নাম দেয়া যেতে পারে ‘সূরা কাহফের লেন্স দিয়ে জীবনকে দেখা’।

মনে আছে যে আমরা সূরা কাহফের একটা ফাযীলাত বলেছিলাম যে এটা এক জুমুআবার থেকে আরেক জুমুআবার পর্যন্ত আমাদের জন্য নুর হবে? আমরা যদি সূরা কাহফের লেন্স দিয়ে জীবনটাকে দেখি, তাহলে আমার মনে হয় সেটা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে একটা light হিসেবে কাজ করবে যা আমাদের পথ দেখাবে।

সূরা কাহফের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা সব ধরনের মানুষদের জন্য আলোকবর্তিকা হতে পারে। আপনি যদি সংখ্যালঘু অথবা অসহায় কেউ হন তাহলে আপনার জন্য উদাহরণ রয়েছে গুহাবাসীদের ঘটনায়। আপনি যদি সম্পদশালী হন আপনার জন্য উদাহরণ রয়েছে দুই বাগানের মালিকের ঘটনায়। আপনি যদি অনেক ক্ষমতাবান কেউ হন আপনার জন্য উদাহরণ রয়েছে যুলকারনাইনের ঘটনায়। আপনি যদি জীবনের গভীর মর্মবাণী বুঝতে আগ্রহী কেউ হন, তাহলে আপনার অবশ্যই জানা উচিত মুসা আলাইহিস সালাম এবং খিদির আলাইহিস সালামের কাহিনী।

ফিরে আসছি আমাদের প্রথম গল্প, গুহাবাসীদের কাহিনীতে। আমরা দেখবো যে কিভাবে আল্লাহ এই ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে গুহাবাসীদের হারিয়ে যাওয়া সম্মান পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সেটা বুঝতে হলে আমাদের একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে।

আমরা হয়তো জানি যে আজকের অধিকাংশ ক্রিস্টান ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর ছেলে ভাবে (আস্তাগফিরুল্লাহ)। এটা কিন্তু হঠাত করে একদিনে হয়ে যায় নাই। পল, যাকে বলা হয় আধুনিক ক্রিস্টানিটির জনক, তার একটা বিশাল ভূমিকা আছে এখানে, যে ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্য ছিলো না। সেই মূলত ঈসা আলাইহিস সালামের আসল বিশ্বাসকে বিকৃত করেছিলো। কিন্তু প্রাথমিকভাবে তার অনুসারীরা ছিলো সংখ্যা লঘু। ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মাঝে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যেটা তৎকালীন রোমান শাসকদের চক্ষুশুল হয়ে ওঠে। কেউ ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী হয়েছে জানতে পারলেই তাদের উপর নেমে আসতো অত্যাচারের খর্গ। কিন্তু তাতেও আসলে মানুষের ধর্মান্তরকরণ ঠেকানো যাচ্ছিলো না, বরং এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে দমন করতে করতেই রোমানদের শক্তি আর অর্থ এমনভাবে ক্ষয় হচ্ছিলো যে তা পতনের উপক্রম হয়। কথিত আছে যে তখন রাজনৈতিক কারণে তখনকার সম্রাট কন্সটান্টাইন ক্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন । পলের যে বিকৃত মতবাদ ছিলো, সেগুলোকে অফিশিয়ালি প্রতিষ্ঠিত করার কাজটা তার আমলেই হয়েছিলো। কিন্তু এই সব মতবাদ যেমন ত্রিত্ত্ববাদ (আল্লাহ তিনের এক), ঈসা আলাইহিস সালামই আল্লাহ বা উনি আল্লাহর ছেলে এগুলো উনার প্রকৃত

শিক্ষার সাথে এতটাই সাংঘর্ষিক ছিলো যে সাধারণ মানুষ এটার প্রবল বিরোধিতা করে। তখনও রোমান শাসকরা একত্ববাদীদের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতে থাকে।

এখানে আমাদের জানা জরুরী যে কুরআন আমাদেরকে গুহাবাসীদের পরিচয়, সংখ্যা, তারা কোন শহরের, কোন সময়ের ছিলেন এগুলো কিছুই জানাচ্ছে না। তাই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে উনাদের সাথে আসলে ঠিক কী ঘটেছিলো। কোনো কোনো মুফাসসির বলছেন যে উনারা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছেন এটা জানার পর পৌত্তলিক শাসক সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন, কেউ বলছেন তারা সম্রাট কন্সটান্টাইন ক্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরের সময়ের মানুষ, যারা বিকৃত বিশ্বাসগুলো গায়ের জোরে মানুষের মাঝে অন্তর্লীন করে দেয়ার প্রবল বিরোধিতা করেছিলো।

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কুরআন আমাদেরকে যা কিছু জানায় নি, সেটা জানা আমাদের জন্য জরুরী না। কুরআন কোনো ইতিহাস গ্রন্থ না যে আমাদের এসব কাহিনীর সাল, স্থান এসব বলবে। কুরআন থেকে আমরা শুধু জানছি যে গুহাবাসীর এই সব যুবকরা তাওহীদের আপোষহীণ পতাকাবাহক ছিলেন, তাদের সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে গিয়ে তারা এক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং তারা এই বিশ্বাসের কথা রাজার সামনে গিয়ে সরাসরি বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, কারণ এর মাধ্যমেই আল্লাহ গুহাবাসীর হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিভাবে?

খ্রিস্টানরা যখন Seven Sleepers এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতো, তাদের ঘটনা বলতো, তারা দাবী করতো যে এই সাতজন ছিল ‘তাদের লোক’ মানে ট্রিনিটি বা ত্রিতত্ত্ববাদে বিশ্বাসী।কিন্তু কুরআন এসে প্রকৃত সত্য তুলে ধরছে যে উনারা ছিল "তাওহীদের সত্যিকার অনুসারী"।

মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো একদমই এড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ এটাই মূল মেসেজটাতে ফোকাস করেছেন। এছাড়াও এই কাহিনী থেকে আরো অসংখ্য শিক্ষণীয় আছে, যেমন

১) গুহাবাসীরা ছিলো বয়সে তরুণ, যেটা কুরআন স্পষ্ট করে জানাচ্ছে, অর্থ্যাৎ তাওহীদের আদর্শ জীবনে ধারণ করার পারফেক্ট সময় এটাই।

২) আল্লাহ চাইলে আপাত কষ্টকর একটা ব্যাপার খুব শান্তিময় করে দিতে পারেন, তাইতো গুহার মতো একটা অস্বস্তিদায়ক জায়গায় এতদিন ঘুমানোর প্রসংগে যে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হল মিরফাকহ। এটা হচ্ছে এমন এমন একটা অবস্থান যেখানে আরামে চোখ বুজে আসে।

এই প্রসঙ্গে ১৮ নাম্বার আয়াতের একটা অংশ আমার খুব ভালো লাগে। আল্লাহ বলছেন যে 'আমরা তাদেরকে ডানে ও বামে পাশ পরিবর্তন করাতাম।"

কেউ বলতে পারবেন যে ঘুমন্ত গুহাবাসীদের প্রেক্ষিতে এই পাশ ফিরানোর ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

আমাদের সময়ে এটা বোঝা অনেক সহজ। আমরা সবাই জানি যে মানুষ একই অবস্থানে সুদীর্ঘ সময়ে থাকলে (যেমন প্যারালাইজড রোগীদের) Bedsore হয়ে যায়, সেখান থেকেই মানুষের পচন ধরে দুর্গন্ধও হয়ে যায় অনেক সময়। এই bedsore এর সমাধান কী?

সমাধান হচ্ছে রোগীর পার্শ্ব পরিবর্তন করে দেওয়াএবং এই জিনিসটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে আমাদের জানাচ্ছেন। আমি একজন ডাক্তারের কথা শুনেছিলাম যিনি এই আয়াতটা পরে এতটাই অবাক হয়েছিলেন যে এই একটা আয়াতই তাকে প্র্যাকটিসিং মুসলিম বানিয়ে দিয়েছিলো।

৩) জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জিনিস এড়িয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে।এজন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে চিনতে হবে।আর তা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবো,প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারবো।

এরকম অসংখ্য পয়েন্ট আমরা পেতে পারি যদি আমরা এই গুহাবাসী সংক্রান্ত সব আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করি। কিন্তু আমাদের এই সিরিজের উদ্দেশ্য সেটা না। তাই আমরা সেগুলোতে যাচ্ছি না। আমরা এখন ফোকাস করবো এই কাহিনীর সাথে দাজ্জালের সম্পর্কে। আমরা আপনাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো যেটা আপনাদের চিন্তার খোরাক দিবে ইনশাল্লাহ

১) আল্লাহ যে গুহাবাসীদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটাকে ঊনি রহমত হিসেবে উল্লেখ করছেন। কেন?

২) গুহাবাসীরা কয়জন ছিলো এটা নিয়ে কুরআন কি পরোক্ষভাবে কিছু বলছে? কিভাবে?

৩) গুহাবাসীরা কতদিন ঘুমন্ত ছিলো সেটা নিয়ে কুরআন কী বলছে? সেটার সাথে কি আপনি বিখ্যাত কোনো সাইন্টিফিক থিওরীর মিল পান? এই থিওরীর সাথে দাজ্জালের কি কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে? সেটা কি? কুরআন কি আরো একাধিক জায়গায় এই বিষয়টার উল্লেখ করেছে? কোন প্রসঙ্গে?

৪) গুহাবাসীরা যখন শাসকের সামনে দ্ব্যর্থহীণ কণ্ঠে তাদের বিশ্বাসের কথা তুলে ধরেছিল তখন স্বাভাবিকভাবেই সেটার ফলাফল হল ভয়ংকর। শাসকের ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনদিনের সময়ে প্রদান, নতুবা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ!

যুবকরা বুঝতে পারলো যে এহেন পরাক্রমশালী শক্তির সাথে তারা পারবেনা। তখন তারা পালিয়ে একটা গুহায় আশ্রয় নিলো যাতে শত্রুরা তাদের খুঁজে না পায়। তারা এই যে নিজেদের জীবন বাঁচাতে গুহাতে চলে গিয়েছিলো, সেটা কি কোনোভাবে দাজ্জালের সাথে সম্পর্কিত? উনাদের এই ঘটনা থেকে আমরা কি এই উপসংহারে আসতে পারি যে কোনো কঠিন ফিতনার সম্মুখীন হলে আমাদের এভাবে নিজেদের Withdraw করে নেয়া উচিত?

৭ম পর্ব

আজকে আমরা গত পর্বে উল্লেখিত পয়েন্টগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। প্রথম প্রশ্ন ছিলো যে ঊনাদেরকে যে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটাকে আল্লাহ রহমত হিসেবে উল্লেখ করছেন কেন। আমরা একটু চিন্তা করলে দেখবো যে আমরা যখন মানসিক অথবা কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগি, তখন আমাদের প্রথম রেস্পন্স হয় 'ঘুম না আসা'। আমরা অনেক সময়ই খুব কষ্টকর একটা পরিস্থিতিকে বর্ণনা করি 'নির্ঘুম রাত' হিসেবে। এখন এই যে একটা কঠিন সময়-মাথার উপরে মৃত্যুদণ্ড ঝুলছে, পালিয়ে এসেছেন, এই গুহাতে কতদিন, কিভাবে থাকবেন সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই, এমন একটা পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর একটা রহমত। এই আয়াত পড়ার পর আমরা দুআ করতে পারি যে আল্লাহ আপাত দৃষ্টিতে কঠিন সময়গুলোতেও তুমি আমাদের এভাবে তোমার রহমতের চাদরে ঢেকে দিও। এভাবে কুরআনের আয়াত পড়ে যদি সেটাকে দুআতে পরিণত করা যায় তাহলে আল্লাহর সাথে কথোপকথনের একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয় আলহামদুলিল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলো গুহাবাসীদের সংখ্যা নিয়ে। উনারা কতজন ছিলো এটা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলছিলো সেটা আমরা বলেছি, আল্লাহ আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে এটা গায়েবের জ্ঞান, এটা জানা আমাদের জন্য জরুরী না। অর্থ্যাৎ গুহাবাসীদের সংখ্যাটা ফোকাস হবে না, হবে ওরা কিসের জন্য ত্যাগ করেছিলো সেটা। তবে হ্যাঁ, মুফাসসিররা আলোচনা করেছেন যে আল্লাহ সূক্ষ্মভাবে আমাদের জানাচ্ছেন যে ওদের সংখ্যা সাত ছিলো, কারণ আগের সংখ্যাগুলোকে

আল্লাহ Refute করেছেন, কিন্তু ‘সাত’ সংখ্যার পর বলেছেন গায়েব আল্লাহই জানেন। আমি এই পয়েন্টটা উল্লেখ করলাম এটা বুঝাতে যে কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণার কি দারুণ ঐতিহ্য আমাদের ছিলো, যেটা আমরা হারাতে বসেছি একদমই!

তৃতীয়ত, গুহাবাসীরা কতদিন ঘুমন্ত ছিলো সেটার ব্যাপারেও আল্লাহ বলছেন উনিই এটা ভালো জানেন (২৬ নং আয়াত)। আবার ২৫ নং আয়াতে বলছেন যে “তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশো বছর আরো নয় বছর।”

তাহলে কী ব্যাপারটা? আল্লাহ কি আমাদের জানাচ্ছেন গুহাবাসীরা কতদিন অবস্থান করেছিলো, নাকি জানাচ্ছেন না? এটা নিয়ে আমাদের মুফাসসিররা চমৎকার আলোচনা করেছেন।

অধিকাংশ মুফাসসির এটাকে আল্লাহর উক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে আল্লাহ জানাচ্ছেন ওরা কয় বছর অবস্থান করেছিল। আমাদের মনে আছে যে ইহুদীরা প্রশ্ন করেছিলো এই গুহাবাসীদের নিয়ে আর ওদের উদ্দেশ্যই ছিলো প্যাঁচ লাগানো? তাই আল্লাহ বলছেন যে উনি যেটা বলছেন সেটাই সত্যি হিসাব। আহলে কিতাবের কেউ যদি অন্য কিছু দাবী করে, তাহলে উত্তরে যেন বলা হয় যে আল্লাহই ভালো জানেন (২৬ নং আয়াত)।

আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে যারা বছর সংখ্যা নিয়ে নানা মত পেশ করছিল,এটা তাদের উক্তি, আল্লাহ তাদেরটা উল্লেখ করেছেন, আর পরের আয়াতে আমাদের জানিয়েছেন যে কত বছর অবস্থান করেছে এটা আমাদের কনসার্ন হওয়া উচিৎ না।

এখন এটাতো এতক্ষণে স্পষ্ট যে উনারা কতদিন অবস্থান করেছিলেন সেটা আমাদের বিবেচ্য না, কিন্তু এই আয়াতের ভাষাটি বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

একটু অন্যরকম না ভাষাটা? তিনশো বছর, সাথে আরো নয় বছর, এভাবে কেন বলা হচ্ছে? একসাথেই তো বলা যেতো, তিনশো নয় বছর, তাই না?

‘তাফসীর ইবনে কাসিরে’ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ “ঐ সময় ছিলো সূর্যের হিসাবে তিনশো বছর, অর্থাৎ তিনশো সৌরবছর (Solar Year) চাঁদের হিসাবে তিনশো নয় বছর (Lunar Year)। প্রতি একশো সৌর বছরের সাথে তিন বছর যোগ হয়। এভাবে তিনশো সৌর বছরের সাথে (৩*৩) নয় বছর যোগ হয়ে তিনশো নয় বছর হলো।” [তাফসীর ইবনে কাসিরঃ ৫/৫৯]। কেন সৌর বছর এবং চন্দ্র বছর এই দুটো হিসাবের উল্লেখ করা হলো? এর ব্যাখ্যা দেন কাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি বলেন, “ইহুদিরা হিসাব করতো সৌর বছর অনুযায়ী। তাদের হিসাবে গুহাবাসী যুবকেরা ঘুমিয়েছিলো তিনশো বছর।” [তাফসীরে তাবারীঃ ১৭/৬৪৭]

মুসলমানরা হিসাব করে চন্দ্র বছর অনুযায়ী, ইহুদিরা সৌর বছর অনুযায়ী। আল্লাহ এই আয়াতে দুটো হিসাবই উল্লেখ করেন। তাই এই আয়াতটা আল্লাহর উক্তি হোক আর মানুষের কথা, আল্লাহ পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে ইহুদীরা আর আমরা স্বতন্ত্র জাতি, আমাদের অনেক কিছুই এখন আলাদা!

কী দারুণ না ব্যাপারটা?

এতো গেল বাইরের জগতের হিসাব। কিন্তু গুহাবাসীদের নিজেদের কী ধারণা ছিলো অবস্থানকাল নিয়ে?

ওরা ভেবেছিলো ওরা কয়েক মুহূর্ত মাত্র গুহাতে অবস্থান করেছে (১৯ নং আয়াত)। এই যে সময়ের ব্যাপারে আপেক্ষিক ধারণা হওয়া, এটাকে অবশ্যই আইন্সটাইনের Theory of Relativity of Time এর সাথে সম্পর্কিত করা যায়। সময়ের বিভিন্ন মাত্রার কথা সময়ের স্রষ্টা, আমাদের রাব আমাদেরকে বহু বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা যে সময়ের এবং স্থানের বিভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করছি এটা বুঝতে পারলে কুরআন ও হাদীসের অনেক বক্তব্য বুঝা সহজ হয়। যেমন আমরা দেখি যে পরকালে মানুষ দুনিয়াতে কতদিন অবস্থান করেছে সেটাকেও তাদের মনে হচ্ছে মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত (সূরা নাযিআতের শেষ আয়াত)। এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যেটার বিস্তারিত আলোচনায় আজকে যাচ্ছি না।ফিরে আসছি আমাদের মূল পয়েন্টে। সময়ের আপেক্ষিকতার এই কন্সেপ্টের সাথে কি দাজ্জালের কোনো সম্পর্ক আছে?

জ্বী, দাজ্জাল দুনিয়াতে কতদিন অবস্থান করবে সেখানে সময়ের আপেক্ষিকতার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এব্যাপারে হাদীসটি হচ্ছে-

সাহাবীগণ রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করেছেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে। উত্তরে তিনি বলেছেন, "সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত লম্বা। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মত। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে"। আমরা বললাম, "যে দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে?" উত্তরে তিনি বললেন, "না, বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায পড়বে"। (সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ফিতান)

আমি এটার কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাবো না, কারণ আমার সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে যারাই এই ধরণের হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক মাতামাতি করেছেন, তারাই হাদীস শাস্ত্রের উসূল বা মূলনীতিগুলো লঙ্ঘন করে ফেলেছেন। এখানে আমার কাছে রোল মডেল হচ্ছে শ্রোতা

হিসেবে উপস্থিত সাহাবীরা। আমরা কি খেয়াল করেছি উনারা এটা শুনেই কী প্রশ্ন করেছিলেন? নামায কিভাবে পড়বেন!

সুবহানাল্লাহ, এটাই প্রমাণ করে যে নিঃসন্দেহে উনারা শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। এই অদ্ভুত কথা শুনলে আমরা নিশ্চিত জিজ্ঞেস করতাম ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা সাইন্টিফিক্যালী কিভাবে সম্ভব আমাদেরকে ব্যাখ্যা করুন! নামাযের কথা মাথায় আসতো নাকি আল্লাহ মালুম!

চতুর্থত এই যে ফিতনার আশংকায় নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এইটা কেন যেন আমাদের মুসলিমদের মাঝে এখন খুব জনপ্রিয় একটা এপ্রোচ হয়ে গেছে। সবসময় আমাদের মাঝে একটা ঈমান হারাই হারাই ভাব এবং আমরা এটার জন্য কুরআনের রেফারেন্স টানি এই গুহাবাসীর ঘটনা। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটা একটা ভুল বিশ্লেষণ। কারণ গুহাবাসীরা কখনই কোনো চেষ্টা ব্যতিরেকে হাল ছেড়ে দিয়ে গুহাতে বিবাগী হয়ে যান নাই। কুরআনের আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে উনারা উনাদের বিশ্বাসের কথা উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন, শাসকের মুখের উপর জানিয়েছেন যে তার স্বজাতি ভুলের উপর আছে। এর চেয়ে সাহসের ব্যাপার আর কী হতে পারে? আমরা এখন পারবো কোনো দেশের প্রধানকে মুখের উপরে গিয়ে বলতে যে আপনারা শিরকে লিপ্ত?

কোন পরিস্থিতিতে উনারা গুহায় চলে গিয়েছিলেন সেটা নিয়ে আমাদের নিজেদের কল্পনা শক্তি কাজে লাগানোর কোনো দরকার নেই, ২০ নং আয়াতে সেটা পরোক্ষভাবে বলেই দেয়া হচ্ছে- যখন উনারা দেখলেন যে বাইরে থাকার অর্থ নিশ্চিতভাবে যে কোনো একটি- মৃত্যু অথবা শিরকের জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য হওয়া।

আমি নিজে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে অবস্থার পরিবর্তনে অবদান রাখার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পক্ষপাতী। আমি বিশ্বাস করি ময়লা পরিষ্কার করতে হলে ময়লাতে নামতে হবে, তাতে কিছু ময়লা গায়ে লাগবে। কিন্তু আমরা কেউ যদি ময়লা গায়ে লাগবে এই ভয়ে ময়লা পরিষ্কার না করতে যাই তাহলে সেই ময়লা ড্রেনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, উপচায়ে যখন পড়বে তখন গায়ে ময়লা মাখামাখি হয়ে যাবে, শুধু আমার না, শুচিবায়ুগ্রস্ত সবার। সামনের পর্বগুলোতে আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ যে কিভাবে মুসলিম জাতিগুলো তাদের স্বকীয়তাই হারিয়ে ফেলেছে পশ্চিমা উপনেবিশকতার সময় এভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করায়, যেটার জের আমরা আজও বয়ে চলছি।

আমি বিশ্বাস করি যে ময়লা ড্রেনে থাকতে থাকতেই পরিষ্কারের উদ্যোগ নিলে অনেক কম ময়লা গায়ে লাগিয়েই আমরা বেঁচে যাবো ইনশাল্লাহ। তবে অবশ্যই এজন্য আমাদের নিজেদের

Strength, weakness এগুলো পর্যালোচনা করতে হবে, যদি কেউ ভয় করেন যে ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে কিছুই করতে পারবেন না, উলটা ময়লার দুর্বিপাকে হারিয়ে যাবেন, তাহলে অন্য কথা কিন্তু ময়লা গায়ে লাগবে বলে সব কিছু থেকে নিজেদের দূরে রাখার যে একটা Common Tendency মুসলিমদের মাঝে দেখা যায়, সেটা আমি খুব অপছন্দ করি। সুদভিত্তিক ব্যবস্থা নিয়ে জানতে হলে এটার Ins and Out জানতে হবে.....ইসলামী আইন কেন শ্রেষ্ঠ সেটা বুঝাতে হলে সেক্যুলার আইন নিয়ে জানতে হবে---------এমন অসংখ্য উদাহরণ আমি দিতে পারি ইনশাল্লাহ। (এটা অবশ্যই আমার ব্যক্তিগত মত এবং ভুল হলে আল্লাহ যেন মাফ করেন)

আমার আস্থা আল্লাহর ওয়াদাতে যেখানে উনি আমাদের জানাচ্ছেন যে শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল, উনি ঈমানদারদের সাথে আছেন। নিচের হাদীসটি আমাকে খুব সাহস যোগায়-
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

“শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। আর সবকিছুতেই কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং যাতে তোমার কল্যাণ রয়েছে তা অর্জনে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। তবে যদি তোমার কোন কাজে কিছু ক্ষতি সাধিত হয়, তখন তুমি এভাবে বলো না যে, “যদি আমি কাজটি এভাবে করতাম তা হলে আমার এই এই হত।” বরং বল, “আল্লাহ এটাই তকদীরে রেখেছিলেন। আর তিনি যা চান তা-ই করেন।” কেননা ‘যদি’ শব্দটি শয়তানের কাজের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়।” (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৮)।

আল্লাহ আমাদের শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তৌফিক্ব দিন, যে পৃথিবী বদলানোর স্বপ্ন দেখে। এই উচ্চাকাংখার প্রেরণাও আমি পাই নিচের হাদীস থেকে-

“তোমরা যখন আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদউস কামনা করবে। কারণ, তা হল, উৎকৃষ্ট ও উন্নততর জান্নাত। এ জান্নাতের উপর রয়েছে পরম করুণাময় আল্লাহর আরশ। তা হতে জান্নাতের নহর সমূহ প্রবাহিত হয়”। (সহীহুল বুখারী ২৭৯০,৭৪২৩)

আমরা কি বুঝলাম যে কিভাবে গুহাবাসীর ঘটনা আমাদের দাজ্জালের ফিতনার ব্যাপারে গাইডলাইন দিতে পারে? শুধু তাই না, যে জীবন গুহাবাসীর লেন্স দিয়ে দেখা হয় সেটা কী পরিমাণ তাক্বওয়া, আত্মত্যাগ আর সাহসের জীবন?

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

এই পর্বে তথ্য সংযোজনে সহায়তা নেয়া হয়েছে নিচের দুটি লেখা থেকে-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2576666019241014&id=100006929225979

https://www.muslimmedia.info/.../17/sura-kahaf-at-the-end-time

আল্লাহ লেখকদ্বয়কে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

৮ম পর্ব

আজকে আমরা দ্বিতীয় কাহিনীটা নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ যেটা ৩২ নাম্বার আয়াত থেকে শুরু হয়েছে। এখানে একজন দারুণ সম্পদশালী ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে যার সম্পত্তির বিবরণও কুরআন আমাদের দিচ্ছে ঐশ্বর্যের লেভেল বুঝানোর জন্য। এই সম্পদ তাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল? এখানে সেটাই মূল বিষয়। পরের আয়াতগুলোতে তার এক সঙ্গীর সাথে কথোপকথন তুলে ধরা হচ্ছে যাকে সে খুব গর্ব ভরে বলছিলো যে আমার ধন সম্পদ তোমার থেকে বেশি এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। তার মানে কি? তার এই সম্পদ তাকে অহংকারী করেছিল। এবং আরেকজনের দুর্বল অবস্থা নিয়ে কথা শোনানোর একটা প্রবণতা তার মধ্যে ছিল। যাই হোক, এসব বলতে বলতে সে বাগানে প্রবেশ করলো এবং বললো যে ওর কাছে কখনো মনে হয়না যে এই বাগান ধ্বংস হয়ে যাবে, মানে কিয়ামত হবে। যদি বা হয়ও, তাহলে সে নিশ্চিত যে সে আল্লাহর কাছে এর চেয়েও উত্তম কিছু পাবে। এইবার তার সঙ্গী বলে উঠলো যে তুমি কি সেই স্বত্ত্বার সাথে শরীক করছো যে তোমাকে সামান্য একটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই যে সহায় সম্পত্তি, সন্তান সন্ততি, এগুলো সবই তো আল্লাহর দান, এগুলো কি তোমাকে বিনয়ী করা উচিত ছিলো না? এমনও তো হতে পারে যে এগুলো আল্লাহ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিবেন এবং আমার অবস্থা বদলিয়ে দিবেন। Irony হচ্ছে আসলেই আল্লাহ এই সব সম্পত্তি ধ্বংস করে দিলেন, তখন লোকটা আফসোস করতে লাগলো যে কেন সে শিরক করেছিলো।

এখন এই ঘটনার সাথে দাজ্জালের সম্পর্ক কী? সম্পর্কটা একদম স্পষ্ট। ব্যক্তি দাজ্জাল আমাদেরকে এক চরম প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্যের ফিতনাইয় ফেলবে। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি-

আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল যমীনে তার গতি কিরূপ হবে? তিনি বললেনঃ “মেঘের মত, যাকে বাতাস হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, সে এক কওমের নিকট আসবে তাদেরকে আহ্বান করবে, ফলে তারা তার ওপর ঈমান আনবে ও তার ডাকে সাড়া দিবে, অতঃপর সে আসমানকে নির্দেশ করবে আসমান বৃষ্টিপাত করবে, যমীনকে নির্দেশ করবে যমীন শস্য জন্মাবে, এবং তাদের জন্তুগুলো সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে উঁচু চুটি, দুধে পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ দেহ নিয়ে। অতঃপর এক কওমের নিকট আসবে তাদেরকে দাওয়াত দিবে, কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে, সে তাদের থেকে চলে যাবে ফলে তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে তাদের হাতে তাদের সম্পদের কিছুই থাকবে না। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)

আর যদি আমাদের জীবদ্দশায় ব্যক্তি দাজ্জাল না আসে? তাহলেও এই দ্বিতীয় ঘটনাটার লেন্স দিয়ে জীবনটাকে দেখলে কোটি কোটি রিফ্লেকশন আসতে বাধ্য। আমরা প্রশ্নোত্তরের আকারে সেগুলোতে আলোকপাতের চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।

১) নিজের জীবনের নিয়ামতগুলো নিয়ে কথা বলতে আমাদের সবার ভালো লাগে। ফেসবুকে ‘ফিলিং ব্লেসড’ এর স্ট্যাটাস আর ছবি দেয়ার হিড়িক থেকে এটা খুব স্পষ্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি খুব তিরস্কারযোগ্য কিছু? লোকটি যখন তার সঙ্গীকে শুনাচ্ছিলো তার সম্পদ ও সন্তানের কথা তখন সেটা কি খুব খারাপ কিছু? আমরা সবাই কি এই কাজ করি না? এটার ফলে সমাজে তৈরি হওয়া কোনো ক্ষতিকর ট্রেণ্ডের কথা কি আপনার মনে হচ্ছে?

২) লোকটি বলেছিলো যে তার কাছে মনে হয় না এই সম্পত্তি কখনো ধ্বংস হবে। কেন তার এটা মনে হয়েছিলো? কোন মানসিকতা এর পেছনে দায়ী বলে আপনার মনে হয়?

৩) লোকটার কাছে কেন মনে হয়েছিলো কখনো কিয়ামত হবে না? আমাদের কোনো মানসিকতার সাথে এটার মিল পাই?

৪) লোকটা বলেছিলো তার ধারণা পরকালে সে এর চেয়েও ভালো কিছু ভাবে? এই আত্মবিশ্বাসের পিছনে তার কি চিন্তা কাজ করেছিলো বলে আপনার মনে হয়?

৫) যখন লোকটার সম্পত্তি সব ধ্বংস হয়ে গেলো তখন সে বলেছিলো, হায় আমি যদি আল্লাহর সাথে শিরক না করতাম। এখানে সে কিভাবে শিরক করেছিলো বলে আপনার কাছে মনে হয়?

৬) এই কাহিনীতে দুইজনের কথোপকথন থেকে আমরা দাওয়াতী কাজের একটা কৌশল শিখতে পারি। সেটা কী বলে আপনার কাছে মনে হয়?

আমার কাছে মনে হয় এই কাহিনীটা বলা শেষ করার পর এটার একটা অসাধারণ সারমর্ম আল্লাহ দিচ্ছেন ৪৫ নং আয়াতে-

তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

আমি জানিনা কেন কিন্তু এই আয়াতটা পড়লে আমার বুকের মাঝে কেমন যেন একটা তীব্র হাহাকার সৃষ্টি হয়। আপনাদের কারো কি এই করোনাকালে এই আয়াতটাকে খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে? আপনারা এটার কোনো উদাহরণ দিতে পারবেন কিভাবে এই আয়াতটা এখন আমাদের জীবনে তীব্র সত্য হয়ে ধরা দিলো?

৯ম পর্ব

গত পর্বে আমরা কিছু প্রশ্ন করেছিলাম যেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।

১) নিজের জীবনের নিয়ামতগুলো নিয়ে কথা বলা কি খুব খারাপ কিছু? আমরা সবাই কি এই কাজ করি না? এটার ফলে সমাজে তৈরি হওয়া কোনো ক্ষতিকর ট্রেণ্ডের কথা কি আপনার মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, নিজের জীবনের নিয়ামতগুলো কথা বলতে আমাদের সবারই ভালো লাগে। সেটা হতে পারে টাকা-পয়সা, বাচ্চা, বিবাহিত জীবন ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়েই। সম্ভবত আমরা সবাইই কম বেশী এই কাজ করি। এমনিতে হয়তো ব্যাপারটা তিরষ্কার করার মত বিশাল কিছু না কিন্তু আপাত নির্দোষ স্বভাবটাই সামাজিক ব্যাধির রূপ নিতে পারে যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় খোঁচা দেয়া, যেভাবে এই কাহিনীর লোকটি বলেছিলো যে আমিতো তোমার চেয়ে ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে উত্তম। তার চেয়েও বড় সমস্যা হতে পারে যদি আমি কথার 'Tone' দিয়ে এটা বুঝাই যে আমি তোমার চেয়ে উত্তম, সেজন্য আমার এসব কিছু আছে। তোমার কিছুই নাই। তখনই মানুষের

মাথায় আগুন ধরে যায়, একটা প্রতিযোগিতার প্রবণতা তৈরি হয়। যেন তেন উপায়ে সে দুনিয়ার এইসব জিনিস পেতে চায়। মাজারে গিয়ে শিরক করে হলেও বাচ্চা চায়, সুদ ঘুষ নিয়ে হলেও বড়লোক হতে চায়।

এটার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবত আজকাল যখন আমরা দেখি যে শিক্ষিত মা-বাবারাও প্রশ্ন ফাঁস হলে টাকা দিয়ে কিনছে কিংবা বাচ্চাদের নকল সরবরাহ করছে। এটা যে কত ভয়াবহ একটা নৈতিক বিপর্যয়, আমরা যেন বুঝতেই পারছি না। একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখবো যে এর মূল কারণ হচ্ছে 'এ প্লাস' না পেলে মুখ দেখানো যাবে না এই চিন্তা। এজন্য আমার প্রায়ই মনে হয় যে আজকাল আমরা একটা ইলাহ এর পূজা করি নিয়মিত। সেই ইলাহ হচ্ছে 'মানুষ কী বলবে!'

২) লোকটার কেন মনে হয়েছিলো যে তার কাছে মনে হয় না এই সম্পত্তি কখনো ধ্বংস হবে?

যেটা একটু আগে বললাম যে যখন আমরা ভাবতে থাকি এই সব কিছু পুরোপুরি আমাদের নিজেদের অর্জন, আমরা ভুলে যাই যে আল্লাহ দিয়েছেন এবং আল্লাহ যে কোন সময় নিয়ে যেতে পারেন, তখনই আমরা ভাববো যে এই জিনিসগুলো কখনোই আমাদের ছেড়ে যাবে না।

এই প্রসংগে ডঃ লরেন্স ব্রাউন, আমার খুব প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব যিনি রিভার্ট, ঊনার একটা কথা খুব ভালো লাগে। উনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে আপনি কোন ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এসেছেন, উনি উত্তরে বলেছিলেন আমার কোনো ধর্ম ছিলো না কারণ আমি আমার জীবনে কখনোই সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি।উনি দুনিয়ার সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল একজন ব্যক্তি ছিলেন, জীবনের সবকিছুই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছিল।এজন্য উনি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করছিলেন, উনি অবিশ্বাসী হইয়ে গিয়েছিলেন। এরপর উনার প্রথম সন্তান যখন জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল, তখন নীল হয়ে যাওয়া সন্তানের মুখ দেখে উনি বুঝে ছিলেন যে শ্রেষ্ঠ হার্টের ডাক্তার হয়েও উনার করার কিছু নেই এখানে। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে উনি জীবনে প্রথম আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বিষইটা খুব গভীর কিন্তু!

৩) লোকটার কাছে কেন মনে হয়েছিলো কখনো কিয়ামত হবে না?

আসলে আমরা যখন দুনিয়াতে খুব ভালো থাকি, তখন এইসব অর্জন একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে এটা ভাবতে আমাদের একদমই ভালো লাগে না। আমরা আমাদের অবচেতন মনে ঠিকই বুঝি যে ওপারের জীবনের জন্য আমাদের সঞ্চয়ের খাতাটা শুন্য। তাই সাজানো গোছানো দুনিয়ার বাড়ি ছেড়ে পোড়া বাড়িতে যেতে হবে ভাবলেই আমাদের ব্যাপারটাকেই অসম্ভব মনে হয়।

৪) লোকটা বলেছিলো তার ধারণা পরকালে সে এর চেয়েও ভালো কিছু ভাবে?

এই চিন্তাটা আসলে এক ধরণের defense mechanism. ওই যে আমরা জানি যে আমাদের সঞ্চয় কিছু নাই, তখন আমরা নিজেদের বুঝ দিতে থাকি যে আরে নাহ, আল্লাহ আমাকে ওই জীবনেও ভালো রাখবে, কারণ আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। কিভাবে সে এটা জানে?

এই যে দুনিয়াতে এইসব কিছু অর্জন, এটাকে সে আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন ভাবে। এই ব্যাপারটা খুব কুতসিত হয়ে যেতে পারে যদি প্র্যাক্টিসিং মানুষেরা কথাবার্তায়, হাব ভাবে এই কথাগুলো বোঝাতে থাকে যে অমুকের জীবনে ইসলাম নেই বলে এই বিপর্যয় এসেছে অথবা আল্লাহ আমাকে ভালবাসে বলে আমার জীবনের সবকিছুই গোছানো ইত্যাদি।

কিন্তু আসলে কি তাই?

এ ব্যাপারে সূরা ফাজরের (৮৯ নং সূরা) ১৫ ও ১৬ নং আয়াত আমার কাছে খুবই তাতপর্যপূর্ণ লাগে। খেয়াল করলে দেখবেন যে আল্লাহ যখন ধন-সম্পদ দিচ্ছেন তখনও সেটাকে পরীক্ষা বলছেন, আবার যখন কেড়ে নিচ্ছেন সেটা কেউ পরীক্ষা বলছেন।

তাহলে ব্যাপারটা কী? কিভাবে বুঝবো কোনটা পরীক্ষা আর কোনটা রহমত?

কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর।

আমাদের জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন তা যদি আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যায় তবে সেটা রহমত, আর যদি আল্লাহর থেকে দূরে নিয়ে যায় তবে তা শাস্তি। এজন্য লরেন্স ব্রাউনের জীবনের এই দুর্যোগ তাকে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে, নিজের অক্ষমতার ব্যাপারে সচেতন করেছিলো, এটা ছিলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় রহমত। আমাদের মূল প্যারামিটারটা তাই হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আমাদের ঈমান।

আমি জানি না কেন তবে আজকাল আমার খুব মনে হয় যে আমরা ইসলামে আসার পর অনেক বড় কিছু করার চেয়ে আশেপাশের মানুষগুলোর জীবনটা সহজ করে দেওয়াটা মনে হয় বেশী জরুরী। আমরা সবাই কারো না কারো ননদ, শাশুড়ি, বোন বা ভাবি, আমাদের সাহচর্যে থেকে যদি তাদের দম বন্ধ লাগে তাহলে অনেক বড় আমলও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে আমরা যদি তাদের খোঁটা না দেই, তাদের জীবনের অপ্রাপ্তিগুলোর কথা বারবার মনে না করিয়ে দেই তাহলেই আল্লাহ আমাদের উপর বেশী খুশি থাকবেন। আসলে আল্লাহ আমাদের যেসব নিয়ামত দিয়েছেন সেগুলোর হিসাব কিভাবে দিব এই চিন্তা নিয়েই যদি মগ্ন থাকি তাহলেই তো অহংকার আসে না মনে, তাই না? উলটা ভয় লাগার কথা খালি!

৫) যখন লোকটার সম্পত্তি সব ধ্বংস হয়ে গেলো তখন সে বলেছিলো, হায় আমি যদি আল্লাহর সাথে শিরক না করতাম। এখানে সে কিভাবে শিরক করেছিলো বলে আপনার কাছে মনে হয়?

আমাদের অনেকের মাঝেই এই আত্মবিশ্বাস আছে যে আমরা শিরক করি না। এটা হয় কারণ আমরা শিরকের সূক্ষ্ম নানা রূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত নই। এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট যে এই লোক নিজের প্রবৃত্তির পূজা করেছিলো, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবেছিলো। যখন তার বাগান ধ্বংস হয়ে গেলো, তখন সে উপলব্ধি করেছিলো যে সে এতদিন শিরকে লিপ্ত ছিলো। তাই সত্যি বলতে কী আমাদের জীবন যদি আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী না যায় তবে সেটা এক দিক থেকে ভালো। আমাদেরকেকে একটু রিফ্লেক্ট করার অবকাশ দেয় যে আমরা যা করছি ঠিক ঠাক করছি নাকি। দুনিয়ার জীবনটা খুব সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে থাকে, আল্লাহর বিধান না মেনেই তাহলে এক দিক থেকে খুব চিন্তার বিষয়, কারণ হয়তো সব শাস্তি জমা রয়ে যাচ্ছে আখিরাতে জীবনের জন্য। ভাবলেই বুকটা কেঁপে উঠে না?

৬) এই কাহিনীতে দুইজনের কথোপকথন থেকে আমরা দাওয়াতী কাজের কোন কৌশল শিখতে পারি?

সত্যি বলতে কী এই অংশটা আমার সবচেয়ে প্রিয়! আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে লোকটা যখন তার সম্পদ-সন্তান নিয়ে ফুটানি করছিলো, তখন তার সঙ্গী কিন্তু চুপ ছিলো। তার কি খারাপ লাগে নি শুনতে? অবশ্যই, কিন্তু সে সেটা প্রকাশ করে নি। কখন সে মুখ খুললো? যখন লোকটা কুফরী করল-বললো আমি মনে করি না যে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। সে তখন তার প্রকৃত অবস্থান

মনে করিয়ে দিলো, বললো তুমি কি তোমার সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাচ্ছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন? অর্থ্যাত আমরা যে কত তুচ্ছ একটা সৃষ্টি সেটার উপর জোর দিলো.....বোঝালো যে যখন আমাকে তোমার থেকে কম দেখো তখন তোমার বলা উচিত মাশাআল্লাহ। আল্লাহ যা চান তাই হয়। এই যে মনে করিয়ে দেয়া, এটাই কিন্তু দাওয়াতী কাজের সারবস্তু। যদিও সাথে সাথে কাজ হয়নি। কিন্তু পরে যখন ওই ব্যক্তির বাগানের ওপর আসমানি শাস্তি এল তখন সে তার ভুলটা বুঝতে পারল।এখান থেকে আমরা দাওয়াতি কাজের ব্যাপারে কয়েকটা দিকনির্দেশনা পাই-

১) আমাদের কিসে আঁতে ঘা লাগে সেটা চেক করতে হবে। আমাদের অপ্রাপ্তি নিয়ে কথা বললে নাকি আল্লাহর ব্যাপারে সীমালঙ্গন করলে?

২) আমাদের কেউ যদি ব্যক্তিগত আক্রমণ করে, খোঁচা দিয়ে কথা বলে, তাতে নিজে পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ফোকাস ঠিক রাখতে হবে।

৩) যখন কেউ এভাবে কষ্ট দিয়ে কথা বলে, তাতে তাকে দাওয়াত দেয়া বন্ধ করা যাবে না। যে লোক এত বাজে বাজে কথা বলছে, কেয়ামত আসবে না, এরকম একটা লোককে দাওয়াত দিয়ে কী হবে এটা ভাবা যাবে না।

৪) মাথায় রাখতে হবে যে দাওয়াতী কাজের ফলাফল সাথে সাথে পাওয়া যাবে না। আমরা জানি না কখন আমাদের কথার একটা প্রভাব পড়বে অন্যের উপর। আমরা কাউকে কিছু বললে কথাগুলো তার ব্রেনের কোষে কোথাও না কোথাও থাকবে এবং যকোন এক সময় অবশ্যই তার মনে পড়বে। যেমন এখানে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা যখন তার সম্পদ গুলো নিয়ে নিল তখন তার ওই সঙ্গীর কথাগুলো মনে পড়লো, সে বলে উঠলো হায় আমি যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করতাম!

আমাদের ২য় কাহিনী নিয়ে কথা বলা এখানেই শেষ। তাহলে যে জীবন এই ২য় কাহিনীর লেন্স দিয়ে দেখা হয় সেটা কেমন? সেই জীবনে প্রাচুর্যের মোহে ছুটতে থাকা এই আমাদের চপেটাঘাত করতে পারে নিচের হাদীসটা-

আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশংকা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববতী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে

তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেবে, যেমন তাদেরকে ধংস ক'রে দিয়েছিল।" (বুখারী ৪০১৫, মুসলিম ২৯৬১)

আমি বলছি না টাকা-পয়সা অদরকারী কিছু। এটা নিষ্ঠুর সত্য যে টাকা পয়সা না থাকলে খুব প্রিয়জনদেরও একটা ভিন্ন রূপ দেখা যায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় পরীক্ষা আসলে ঈমানের উপর। তাই আসুন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো দুআ করি যেখানে উনি অভাব অনটন এবং ঐশ্বর্য, দুইটার পরীক্ষা থেকেই আশ্রয় চাইতে শিখাচ্ছেন-

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায়ই এই দু'আ পাঠ করতেনঃ হে আল্লাহ! আমি দোযখের ফিতনা, দোযখের আযাব, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, অভাব-অনটন এবং ঐশ্বর্যের ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুনান আন নাসায়ী, সহীহ হাদীস।

১০ম পর্ব

গত পর্বে আমরা সূরা কাহাফে বর্ণিত দ্বিতীয় কাহিনীটা শেষ করেছি, তখন বলেছিলাম যে ৪৫ নং আয়াতে যেন আল্লাহ দুনিয়ার জীবনের যে উপমাটা দিচ্ছেন সেটা আমার কাছে এখন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। চিন্তা করুন এখন এই মহামারী কিভাবে আমাদের প্রায়োরিটিগুলো বদলে দিয়েছে। পেপারে পড়ছিলাম যে একজন ইতালী প্রবাসী দুঃখ করেছে যে বিয়ের বাজারে আমি ছিলাম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের চেয়েও দামী। আগে দেশে আসলে মানুষের লাইন ধরে যেত দেখা করার জন্য। এবার কেউই খুশী না আসছি দেখে, উলটা কেমন যেন খ্যাপা। সবকিছু কেমন হঠাৎ করে বদলে গেলো ভাই!

আপনি কি এই ঘটনার সাথে আয়াতটাতে যা বলা হচ্ছে সেটার মিল খুঁজে পান? আপনাকে এখন নিউইয়র্কে যেতে বললে যাবেন আপনি যেখানে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে করোনাতে আক্রান্ত হয়ে? অনেকেতো মনে হয় ফ্রিতেও যাবে না এখন!

যাই হোক, ফিরে আসছি আমাদের কাহিনী বলাতে, আজকে শুরু করবো তৃতীয় কাহিনী ইনশাল্লাহ। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে সূরা কাহাফ এর সবগুলো কাহিনীর মধ্যে কোন কাহিনী থাকে আমার কাছে দাজ্জালের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কিত মনে হয় আমি তাহলে বলব যে এইটা, মানে

মুসা আলাই সালাম এবং খিদির আলাই সালাম এর কাহিনী ।এটা মূলত জ্ঞানের ফিতনা থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সে ব্যাপারে আলোকপাত করছে। কিন্তু জ্ঞানের ফিতনা টা কী জিনিস? আমরা এই কাহিনীর মাধ্যমে সেটাও বোঝার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

এই কাহিনীটা শুরু হচ্ছে 60 নাম্বার আয়াত থেকে, চলছে ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত। এখানে মূল চরিত্র তিনটি- মুসা আলাই সালাম, খিদির আলাইহিস সালাম এবং মুসা আলাই সালাম এর সাথে থাকা যুবক সঙ্গী ছিলেন, ইউশা ইবনে নুন। এখানে উল্লেখ্য যে খিদির আলাইহিস সালাম এবং ইউশা ইবনে নুনের নাম আমরা জানতে পারি হাদিস থেকে, কুরআন থেকে না। হাদীস আমাদেরকে এই কাহিনীর ব্যাকগ্রাউণ্ড তথ্য জানাচ্ছে। ঘটনাটা ছিলো এরকম যে বনি ইসরাইলের একজন লোক এসে মুসা (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাদের কওমের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? মূসা আলাই সালাম দিলেন, আমি! উনি ভেবেছিলেন নবী হিসেবে উনারইতো সবচেয়ে জ্ঞানী হওয়ার কথা। সেই দিক থেকে উনি কিন্তু কোন ভুল উত্তর দেননি। কিন্তু আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'লা এটা পছন্দ করেননি। সঠিক পন্থাটা ছিল মুসা আলাই সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবেন, এবং আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তাঁকে উত্তরটা দেবেন। এই জবাবের কারণে মুসা আলাই সালামের উপর ওহী নাযিল হল যে দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আল্লাহর এক বান্দা মুসা মুসা আলাইহিস সালামের চাইতেও বেশি জ্ঞানী। শুনে সাথে সাথে মুসা আলাই সালামের মনে হলো যে, তাহলে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য উনার সাথে সফর করা উচিত। মুসা আলাইহিস সালাম তার সাথে দেখা করার উপায় জানতে চাইলেন। আল্লাহ তাকে জানালেন কিভাবে উনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই মত মুসা আলাইহিস সালাম ইউশা ইবনে নুনকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

এখন এই জায়গায় আমরা একটা বিরতি নিবো। এতক্ষণ আমরা যেটুকু জানলাম সেখান থেকে জ্ঞানের ফিতনার কোনো দিক আপনাদের চোখে পড়ছে কি? আপনারা কি বুঝতে পারছেন সেইসাথে সেটা থেকে বের হয়ে আসার উপায়ও আমাদের শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে? উপায়টা কী?

মুসা আলাইহিস সালাম সাথে একটা ভাজা মাছ নিয়ে গিয়েছিলেন খাবার হিসেবে। আল্লাহ জানিয়েছিলেন, যে জায়গায় গিয়ে মাছটা জীবন্ত হয়ে যাবে, বুঝতে হবে সেই জায়গায় খিদির আলাইহিস সালামকে পাওয়া যাবে। ওই জায়গায় যখন উনারা পৌঁছালেন সে সময় মুসা আলাইহিস সালাম একটু ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। ইউশা ইবনে নুন জেগে ছিলেন এবং তিনি দেখলেন যে মাছটা জীবন্ত হয়ে সুরঙ্গ পথ সৃষ্টি করে সেখানে নেমে গেল। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন উনি এটা তাঁকে বলতে ভুলে গেলেন। উনারা আবার চলতে শুরু করলেন এবং একসময় দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের স্থানটা অতিক্রম করে চলে গেলেন। একসময় মুসা আলাইহিস সালাম বললেন যে, আমি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি, খাবারটা নিয়ে আসো, আমরা খেয়ে নেই। তখন ইউশা ইবনে নুন এর মনে পড়লো, যে মাছটা তো জীবন্ত হয়ে চলে গিয়েছিলো। ৬৩ নং আয়াতে উনি নিজেকে ডিফেণ্ড করার জন্য একটা কথা বলেন। আপনাদের কাজ হচ্ছে সেই আয়াতটা পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে চিন্তা করা-

১) ইউশা ইবনে নুন নিজের স্বপক্ষে কী যুক্তি দিয়েছিলেন?

২) এই যুক্তি থেকে আমরা শয়তানের কোন কৌশল সম্পর্কে জানতে পারি?

৩) শয়তানের এই অনুরূপ কৌশলের আরো কোনো উদাহরণ কি আপনার মনে পড়ে যা কুরআনে আছে?

৪) এই কৌশল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি?

ফিরে আসছি কাহিনীতে। মুসা আলাইহিস সালাম ও ইউশা ইবনে নুন নিজেদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে আবার সেই জায়গায় ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে উনারা খিদির আলাইহিস সালামের দেখা পেলেন। ঊনার ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ জ্ঞান এবং রহমত দান করা হয়েছিলো। মুসা আলাইহিস সালাম সত্যপথের সেই জ্ঞান থেকে আহরণের জন্য উনাকে অনুসরণের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু খিদির আলাইহিস সালাম সহজে রাজি হলেন না। উনি মুসা আলাই সালামের ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী করলেন যে উনি তার সাথে থাকতে পারবেন না।

এই পর্যায়ে এসে আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হল, কারণ হিসেবে খিদির আলাইহিস সালাম কী বলেছিলেন? উনার এই বক্তব্য থেকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ব শর্ত কি আপনি চিহ্নিত করতে পারেন? সেটা কী? আমাদের সময়ে এটা বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং কেন?

যাই হোক, প্রতিউত্তর মুসা আলাইহিস সালাম জানালেন যে উনার আত্মবিশ্বাস আছে যে উনি জ্ঞান অর্জনের এই পূর্ব শর্ত মেনে চলতে পারবেন। তখন খিদির আলাই সালাম উনাকে শর্ত দিলেন যে মুসা আলাইহিস সালাম তাকে অনুসরণ করতে পারবেন, তবে শর্ত হচ্ছে উনি যা-ই করুক না কেন সেটার ব্যাপারে মুসা আলাইহিস সালাম কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খিদির আলাইহিস সালাম নিজেই মুখ খোলেন। মুসা আলাই সালাম এতে রাজি হলেন।

এখানে স্পষ্ট যে খিদির আলাইহিস সালামের মাঝে মুসা আলাইহিস সালামকে নিরুৎসাহিত করার একটা প্রবনতা ছিলো। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম যে কোনো মূল্যে খিদির আলাইহিস সালামের জ্ঞান থেকে লাভবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এখান থেকে আমরা জ্ঞান অর্জনের আরেকটা আদবের ব্যাপারে জানতে পারি। সেটা কী?

১১তম পর্ব

গত পর্বে আপনাদের কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, আজকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

১) ইউশা ইবনে নুন যখন ভুলে গেলেন মূসা আলাইহিস সালামকে মাছ জীবন্ত হয়ে চলে যাওয়ার কথা বলতে, তখন নিজের স্বপক্ষে কী যুক্তি দিয়েছিলেন?

উনি নিজের পক্ষে এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে শয়তানই উনাকে এটা ভুলিয়ে দিয়েছে।

২) এই যুক্তি থেকে আমরা শয়তানের কোন কৌশল সম্পর্কে জানতে পারি?

এখান থেকে আমরা শয়তানের যে কৌশলের ব্যাপারে জানতে পারি তা হল- শয়তান আমাদেরকে অনেক জরুরি জিনিস ভুলিয়ে দেয়। সেটা হতে পারে দুনিয়াবী কোনো কাজ বা আল্লাহর স্মরণ। দুনিয়াবী কাজ ভুলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমাদের অনেক সময়/এনার্জি এসব নষ্ট হতে পারে যেমন এখানে মূসা আলাইহিস সালামের হয়েছে, আবার সম্পর্কও নষ্ট হতে পারে। আর চিন্তা করলে দেখবো যে আমরা যাবতীয় পাপকাজ করি যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হই। বিস্তারিত উদাহরণে আর যাচ্ছি না, এমন অনেক আয়াত আছে কুরআনে।

৩) শয়তানের এই অনুরূপ কৌশলের আরো কোনো উদাহরণ কি আপনার মনে পড়ে যা কুরআনে আছে?

এমন আরেকটি উদাহরণ আমরা পাই সূরা ইউসুফে যেখানে জেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রাজার কর্মচারী ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্বপ্নব্যাখ্যা করার অসাধারণ দক্ষতার কথা, উনি যে নির্দোষ জেল খাটছেন সেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলো, ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে অতিরিক্ত আরো কয়েক বছর জেল খাটতে হয়েছিলো।

৪) শয়তানের এই কৌশল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি?

শয়তানের এই ফাঁদ থেকে বাঁচতে হলে আমরা একটু গোছানো জীবন যাপনের চেষ্টা করতে পারি, ধরেন To do list করার অভ্যাস করতে পারি মোবাইলে, তাহলে ব্রেনের উপর মনে রাখার চাপ কম পড়বে, সাথে যখন অবসর সময় থাকি কিংবা যখন জিকির করি, "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজিম" এই জিকিরটা করতে পারি- বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

খিদির আলাইহিস সালামের কাছে মূসা আলাইহিস সালাম যখন শিখতে চাইলেন, তখন খিদির ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে মূসা আলাইহিস সালাম পারবেন না লেগে থাকতে। কারণ হিসেবে উনি কী বলেছিলেন? উনার এই বক্তব্য থেকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ব শর্ত কি আপনি চিহ্নিত করতে পারেন? সেটা কী? আমাদের সময়ে এটা বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং কেন?

খিদির আলাইহিস সালাম মন্তব্য করেছিলেন যে মূসা আলাইহিস সালাম কিছুতেই ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন না, মানে এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকবে যাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে উনাদের যাত্রাপথের বর্ণনার আয়াতগুলোতে বারবার এই 'সবর' তথা ধৈর্য্যের কথা এসেছে। এখান থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের জানানো হচ্ছে জ্ঞান আহরণের পূর্বশর্তই হচ্ছে ধৈর্য্য। সত্যি বলতে কী, আমি নিজের জীবন দিয়ে এটা উপলব্ধি করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি যখন Islamic Online University তে ভর্তি হই তখন সেই ডিগ্রীটা শেষ করা এককথায় ছিলো ধৈর্য্যের পরীক্ষা। এই পথে চলতে গিয়ে বারেবারে আমি আমার শিক্ষকদের কাছে এই ধৈর্য্যের শিক্ষাই পেয়েছি। অনেক ধরণের প্রশ্ন মাথায় আসতো, সেগুলো জিজ্ঞেস করলে কখনো উত্তর পেতাম, কখনো পেতাম না। আমাদের ইন্সট্রাক্টরা প্রায়ই বলতেন, "You will learn this in some subsequent courses". এখন বুঝতে পারি যে উনারা আমাদেরকে ধৈর্য্য শিক্ষা দিতেন। কারণ কিছু জিনিস আছে যে আপনাকে ধারাবাহিকভাবে শিখতে হবে, সিড়ির ধাপের মত, স্টেপ স্কিপ করলে হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে। যে ধৈর্য্য ধরতে পারবে, সেই সফলকাম হবে ইনশাআল্লাহ।

ধৈর্য্য ধরে পড়া চালিয়ে যাওয়ার এই যাত্রা শুরু করার আমিই ছিলাম একদম অন্যরকম। ইসলামে আসার পর চারপাশের নানা অসঙ্গতি দেখে মাথা গরম হয়ে যেতো, তীক্ষ্ম প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলতাম তখনকার শিক্ষকদের, কেন আমরা কিছু করছি না দেখে! তখনও আমার শিক্ষকরা আমাকে ফোকাসড থাকার উপদেশ দিতেন, নিজেকে প্রস্তুত হবার গুরুত্বের উপর জোর দিতেন খুব করে। তাদের দেয়া উপমাটা অনেকটা এরকম ছিলো যে, সব কিছুতেই যদি আমি আংগুল ঢুকিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমি হাতটা নাড়তে পারবো না।

এখন পিছন ফিরে তাকালে আমি এহেন মানসিকতার পেছনের সাইকোল্যোজিটা টের পাই। একটা সুদীর্ঘ সময় অনৈসলামিক জীবন যাপন করার পর ইসলামের বুঝ আসলে একটা প্রচণ্ড পাপবোধ কাজ করতে থাকে। মনে হয় এখন আমাকে অনেক বড় কিছু একটা করে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

এমন চিন্তা থেকেই অনেকে চরমপন্থা অবলম্বন করে ফেলে। আসলে এটা স্রেফ ধৈর্যের অভাব। আমরা আসলে যত ধৈর্য ধরতে পারবো, তত মাথা ঠান্ডা থাকবে ইনশাল্লাহ। আমরা বুঝতে পারবো যে ভিন্নমত থাকবেই, মানুষকে সময় দিতে হয়। রাতারাতি দুনিয়া উল্টে ফেলার দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা কাউকে দেননি। দুনিয়া উদ্ধারের কাজ আমার না, আমি শুধু আমার দায়িত্বটুকু পালন করতে পারি আমার circle of Influence এর মাঝে।এই ধৈর্য্যটা আমাদের থাকতে হবে জ্ঞানার্জনের সময় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

অথচ এই জিনিসটারই আমি সবচেয়ে অভাব দেখতে পাই আমাদের বর্তমান প্রজন্মের মাঝে। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের Attention Span কে শুন্যের কোঠায় এনে দাঁড় করিয়েছে যেটা দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে একটা বিশাল প্রতিবন্ধকতা মনে হয় আমার কাছে। তাছাড়া আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বড্ড বেশী হিসেবী হয়ে গেছি। কাউকে IOU তে পড়তে বললে মানুষ এত কিছু হিসাব করে যে আমার মাঝে মাঝে বড্ড ক্লান্ত লাগে। আমি যখন এখানে পড়ার সিদ্ধান্ত নেই তখন আমার এটা কখনোই মনে হয়নি যে, চার বছর ধরে আরেকটা ব্যাচেলর করবো! কতদিনে শেষ করব? আমার শুধু মনে হয়েছে শুরু করে দেখি না, দেখি না কী হয়! আলহামদুলিল্লাহ, আমি ঠকিনি, ধৈর্য্য ধরে যা শিখেছি, তাতে আমি এখন একটা সামগ্রিক ছবি দেখতে পাই, মাথা অনেক ঠান্ডা হয়েছে। অবশ্যই পরিকল্পনা করে আগানো খুবই জরুরী, কিন্তু প্রচন্ড প্ল্যান করার টেন্ডেন্সি আবার একটু বিপদজনক হতে পারে কারণ আমাদের প্ল্যান মত যদি কিছু না হয় তখন দেখা যায় হতাশা আমাদের গ্রাস করে ফেলে, ঈমানের ওপরও প্রভাব ফেলে। আবার একদম প্লানমত যদি জীবন চলে তাহলে মনে হয় জীবনের স্টিয়ারিংটা যেন আমাদের হাতেও, নিজেকে খুব বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হতে থাকে যেটা কখনোই ভালো না বলেই মনে হয় আমার কাছে।

মূসা আলাইহিস সালাম ও খিদির আলাইহিস সালাম এর কাহিনী পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে খিদির আলাইহিস সালাম যেন পরোক্ষভাবে মুসা আলাইহিস সালামকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম যে কোনো মূল্যে খিদির আলাইহিস সালামের জ্ঞান থেকে লাভবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই যে চ্যালেঞ্জ নেয়ার একটা মানসিকতা থাকা, কোনো

নেতিবাচকতার সামনেই পিছপা না হওয়া এইটা জ্ঞান অর্জনের পথে খুবই জরুরী বলে মনে হয়। অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত, ব্যস্ততাজনিত যত ধরণের চ্যালেঞ্জই সামনে আসুক না কেন ধৈর্য্য ধরে দাঁত কামড়ে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যেতে হবে- এটা জ্ঞান অর্জনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আদব যা আমরা এই কাহিনী থেকে শিখতে পারি।

১২তম পর্ব

আমরা মূসা আলাইহিস সালাম ও খিদির আলাইহিস সালাম এর কাহিনী তে আছি। খিদির আলাইহিস সালামের সাথে মুসার চুক্তি ছিল যে যতক্ষণ না উনি নিজে থেকে কোন কিছু বর্ণনা করবেন, মূসা আলাইহিস সালাম কোন প্রশ্ন, হস্তক্ষেপ বা মন্তব্য করতে পারবেন না। মূসা আলাইহিস সালাম রাজি হয়েছিলেন।

উনারা পথ চলা শুরু করলেন।পথিমধ্যে একটা নদী পড়ল। উনাদের কাছে কোনো টাকা ছিল না, কিন্তু কেউই উনাদেরকে বিনামূল্যে নদী পার করে দেয়ার জন্য রাজি হচ্ছিল না। উনাদের এই অসহায় অবস্থা দেখে একজন মাঝি এগিয়ে এলেন এবং উনাদের বিনামূল্যে নদী পার করে দিলেন। নদীর অপর পারে যাওয়ার পরই খিদির আলাইহিস সালাম নৌকাটা ফুটা করে দিলেন। তাঁর এরকম কৃতঘ্ন আচরণ দেখে মূসা আলাইহিস সালাম খুবই অবাক হলেন। উনি এটার বিরোধিতা করে বললেন যে নিশ্চয়ই আপনি একটা গুরুতর মন্দ কাজ করলেন।

এভাবে উনি প্রথমবারেই শর্ত ভংগ করে ফেললেন। খিদির আলাইহিস সালাম বললেন যে, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরতে পারবেন না?

মূসা আলাইহিস সালাম বুঝতে পারলেন যে উনি শেখার সুযোগ হারাতে যাচ্ছেন। তাই উনি ইগো বা অহংবোধ ধরে না রেখে ভুল স্বীকার করে নিলেন এবং বললেন যে উনাকে আরেকটা সুযোগ দিতে।

আবার উনাদের চলা শুরু হলো। পথিমধ্যে সুন্দর একটা বাচ্চার দেখা পেলেন যাকে খিদির আলাইহিস সালাম হত্যা করলেন। মূসা আলাইহিস সালাম সাথে সাথে প্রতিবাদ করলেন, "আপনি কি একটা নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন, প্রাণের বিনিময় ছাড়াই?

খিদির আলাইহিস সালাম একই উত্তর দিলেন, "আমি আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন না?" মূসা আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় বার শর্ত ভঙ্গ করলেন এবং শেষবারের মত আরেকটি সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করলেন।

আবার উনাদের যাত্রা শুরু হলো। যেতে যেতে উনারা একটা জনপদে গিয়ে পৌঁছলেন। পথ চলতে চলতে তাঁরা ভীষণ ক্লান্ত ছিলেন। তাই সেখানে পৌঁছার পর উনারা মুসাফির হিসেবে সেখানে আশ্রয়/কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু সেই জনপদের অধিবাসীরা কেউ তাদের আতিথেয়তা করতে রাজি হলো না। এসময় তাঁরা সেই জনপদের একটা দেয়াল ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পেলেন। খিদির আলাইহিস সালাম নিজহাতে সেটা মেরামত করে দিলেন।এতে মূসা আলাইহিস সালাম অবাক হলেন। তিনি বললেন, "এই জনপদের লোকেরা আমাদের আতিথেয়তা করতে রাজি হলো না, অথচ আপনি এত পরিশ্রম করে তাদের দেয়াল মেরামত করে দিলেন। আপনিতো এর বিনিময় চাইতে পারতেন?"

এভাবে মূসা আলাইহিস সালাম শেষবারের মত শর্ত ভঙ্গ করলেন এবং খিদির আলাইহিস সালামের সাথে চলার সুযোগ হারালেন।

আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে খিদির আলাইহিস সালাম প্রত্যেকটি ঘটনার ব্যাখ্যা দিলেন। খিদির আলাইহিস সালাম নৌকাটাতে যে ফুটো করে দিয়েছিলেন সেটা ছিল মেরামতযোগ্য। ওই জনপদের রাজা ছিল খুবই অত্যাচারী, সে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মাঝিদের নৌকাগুলি ছিনিয়ে নিতো। যেহেতু খিদির আলাইহিস সালাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিলেন, তাহলে সে আর এই নৌকাটা নিবেনা। ফলে জীবিকা অর্জনের যে অবলম্বন সেটা গরীব মাঝির সাথেই থাকলো এবং পরে সে জিনিসটা মেরামত করে নিল। অর্থ্যাত নৌকাটা ফুটা করে দিয়ে খিদির আলাইহিস সালাম আদতে উনার উপকারই করেছেন।

দ্বিতীয়ত যে বাচ্চাটাকে তিনি হত্যা করেছিলেন ,তার মা-বাবা ছিলেন ঈমানদার। কিন্তু সে বড় হয়ে কুফরী করতো এবং তার মা-বাবাকেও প্রভাবিত করে ফেলতো। এর বদলে পরে আল্লাহ তাদেরকে পবিত্রতা ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একজন সন্তান দান করুক এটা উনি চাচ্ছিলেন।

এই জায়গায় এসে একটা কথা বলাটা জরুরী। আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে যে খিদির আলাইহিস সালাম মানুষ ছিলেন নাকি ফেরেশতা। কুরআন ব্যবহার করছে আরবী শব্দ ‘আবদ’, মানে বান্দা, নির্দিষ্ট করে মানুষ বলা হচ্ছে না। আল্লাহর যেকোনো সৃষ্টিই আল্লাহর বান্দা হতে পারে। এটা বিশেষ

মনোযোগের দাবী রাখে কারণ কোনো শরীয়তই নিষ্পাপ প্রাণ হত্যা করার অনুমোদন দেয় না, যুক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন। তাই এটা হওয়া অসম্ভব না যে খিদির আলাইহিস সালাম আল্লাহর বিশেষ কোনো বান্দা ছিলেন যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞানের এসব মূল্যবান দিক শিখিয়েছেন।

তৃতীয়ত, খিদির আলাইহিস সালাম যে দেয়ালটা মেরামত করে দিয়েছিলেন, সেটা ছিল দুটি এতিম বাচ্চার। এই দেয়ালের নিচে তার বাবা তাদের জন্য গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং তাদের বাবা ছিলেন সৎকর্মশীল। আমরা তো দেখলামই গ্রামবাসীরা কেমন ছিল, সামান্য মুসাফিরকে তারা আপ্যায়ন করে নি। এটা স্পষ্ট যে দেয়াল ভেঙে যদি গুপ্তধন প্রকাশ পেত, তারা সেই গুপ্তধন ইনসাফের সাথে বাচ্চাগুলোকে দিত না, নিজেরাই খেয়ে ফেলত। বাচ্চাগুলোরও করার কিছু থাকত না।এখন খিদির আলাইহিস সালাম যেহেতু দেয়ালটি উঠিয়ে দিলেন সেহেতু আপাতত ওই ধন-সম্পদ গুলা নিরাপদ থাকবে।যখন বাচ্চাগুলো বড় হবে, ওই ধন-সম্পদের দায়িত্ব নেওয়ার মতো যোগ্য হবে তখন হয়তো আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা ওই দেয়ালটা আবার ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, বা কিছু করবেন যাতে বাচ্চাগুলো আবার তাদের সম্পদ পায়। এখানেও খিদির আলাইহিস সালাম আসলে বাচ্চাগুলোর উপকারই করেছেন দেয়ালটা তুলে দিয়ে।

আমাদের কাহিনীর বর্ণনা এখানেই শেষ, এখন সেখান থেকে মণিমুক্তা কুড়ানোর পালা।

যে জীবন মূসা আলাইহিস সালাম ও খিদির আলাইহিস সালাম এর কাহিনীর লেন্স দিয়ে দেখা হয় সেটা কেমন? জ্ঞানের ফিতনার স্বরূপ কি আমরা বুঝতে পারছি এখান থেকে?

কাহিনীর একদম শুরুতে মূসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহকে জিজ্ঞেস না করেই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে উনিই সবচেয়ে জ্ঞানী, তখন আমরা আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে জ্ঞানের ফিতনার কোনো দিক কি এখানে আপনাদের চোখে পড়ছে? এটা থেকে বের হয়ে আসার উপায় কি আমরা এখান থেকে শিখতে পারি? কী সেটা?

আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রাথমিকভাবে মূসা আলাইহিস সালাম যে ভুলটা করেছিলেন-কিছু পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেই যথেষ্ট হয়েছে এমনটা ভাবা কিংবা নিজেকে অনেক জ্ঞানী মনে করা-সেটা হচ্ছে জ্ঞানের ফিতনার একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে মূসা আলাইহিস সালাম সাথে সাথেই নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছিলেন। উনি যখনই শুনলেন যে তার চেয়েও জ্ঞানী কেউ

আছে, তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য উদগ্রীব হয়ে গেলেন। আসলে এটাই জ্ঞানের ফিতনা কাটিয়ে উঠার উপায়- জ্ঞান অর্জনের রাস্তাটা সবসময় খোলা রাখা, তাহলে আত্মতৃপ্তিতে ভোগার সুযোগ থাকবে না ইনশাল্লাহ।

১৩ তম পর্ব

আমরা আজকেও মূসা আলাইহিস সালাম ও খিদির আলাইহিস সালাম এর কাহিনীর লেন্স দিয়ে জীবনটাকে দেখা চালিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। এই কাহিনী থেকে আমি মিলিওন ডলার কিছু শিক্ষা পাই যেটা আমি মনে করি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগানোর মত।

প্রথম ঘটনা, মানে নৌকা ফুটা করে দেয়ার ঘটনা থেকে আমি কী বুঝি? আমাদের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটবে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে খারাপ মনে হলেও কিছু সময়ের মধ্যেই আমরা সেটার মাঝে ভালো দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ। ডঃ বিলাল ফিলিপস আরেকটা উদাহরণ দেন, যে ধরেন কোন কারনে ৫ বা ৬ মিনিটের জন্য আপনি আপনার ফ্লাইট ধরতে ব্যর্থ হলেন, পরবর্তী ফ্লাইট এক বা দুইদিন পরে, আপনি আশঙ্কা করলেন যে সময়মতো যেতে না পারায় হয়তো আপনার চাকরি চলে যাবে বা অন্য কিছু। মানে আপনার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন আপনার কাছে মনে হবে কেন এটা আমার সাথে হলো। ধরেন কিছু সময়ের মধ্যে আপনি জানতে পারলেন যে ওই ফ্লাইটটি দুর্ঘটনায় পড়েছিল এবং কেউ বাঁচেনি। তখন আপনার কাছে মনে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি ফ্লাইটে ছিলাম না। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ঘটনাটার পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারছি। আমাদের ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে যেটার কথা আমরা গত পর্বে বলেছি।

তৃতীয় ঘটনা মানে দেয়াল মেরামত করার ঘটনা থেকে আমরা বুঝি যে এমন কিছু ঘটনা ঘটবে যেগুলোর প্রজ্ঞা আমরা হয়তো অনেক পরে বুঝতে পারবো। হয়তোবা ১০- ১২ বছর লেগে যাবে বুঝতে। মাঝের এই সময়টাতেও ধৈর্য্য ধরতে হবে। এই যে আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট সময় পর ছেলেগুলোর হাতে সম্পদ যেনো পৌঁছায় সেটার ব্যবস্থা করলেন, আল্লাহর এই পরিকল্পনা, টাইমিং.....এগুলোর উপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে। একটা ব্যক্তিগত উদাহরণ দেই। আমার মনে আছে যে আমি যখন IIUM এ ইসলামিক ফাইন্যান্সে ভর্তি হলাম তখন আমার আফসোস হয়েছিলো যে কেন আমি এই সুযোগটা আরো আগে পেলাম না। কিন্তু কিছুদিনের মাঝে আমি উপলব্ধি করলাম যে আল্লাহ আসলে আমাকে এতদিন ধরে তৈরি করেছেন। ইসলামিক ফাইন্যান্স

পড়তে গিয়ে আমি এমন কিছু জিনিস এর সম্মুখীন হয়েছি, যেটা হজম করতে এক ধরনের মানসিক পরিপক্কতা লাগে। এই পরিপক্কতা আমাকে দিয়েছে IOU এর জ্ঞান। ইসলামিক ফাইন্যান্স পড়তে গিয়ে আমি তাল হারিয়ে ফেলতাম যদি আমি এটা বছর দুই আগে পেতাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার সময়জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। সেটা জীবনের সব ক্ষেত্রেই-সন্তান, বিয়ে, চাকরী, সব কিছুর ব্যাপারেই। দরকার শুধু আমাদের রাবের টাইমিং, পরিকল্পনার ব্যাপারে আস্থা।

এই তৃতীয় কাহিনীতে আরো একটি বৈপ্লবিক শিক্ষা আছে। সেটা হচ্ছে, আমি যদি ধার্মিক হই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারকে দেখে রাখবেন। এটা খুব গভীর আর গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা কিন্তু। কেন?

দেখা যায় আমাদের একটা জীবন চলে যায় সন্তানদের পিছনে। সন্তানদের ভালো একটা জীবন দিতে গিয়ে আমল করার সময় পাই না, হয়তো দ্বীনের অনেক কিছুর সাথেই আপোষ করা শূরু করি নিজের অজান্তেই। আপনি যদি একটা ঘুষখোর বা সুদখোরের সাথে কথা বলেন, প্রথম কারণই তারা বলবে জীবন যাত্রার ব্যয়। আমার বাচ্চাকে ভালো স্কুলে পড়াতে চাই ,এটা করতে চাই সেটা করতে চাই। কিন্তু এখান থেকে আমরা শিখি যে আমরা আমাদের পরিবার/ বাচ্চাদের জন্য ঈমানের সাথে কোন আপোষ করবো না ইনশাল্লাহ। যদি আমি কিছু না রেখে যাই , কিন্তু ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করি তাহলে আল্লাহই আমার সন্তানদের অভিভাবক হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ।

দ্বিতীয় কাহিনী থেকে আমরা যেটা শিখি তা হল আমাদের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটবে যেগুলোর প্রজ্ঞা আমরা হয়তো এই জীবনে বুঝতেই পারবো না, যেমনটা ওই বাচ্চাটার মা বাবার সাথে হয়েছে। হয়তো সারা জীবনই হা-হুতাশ করে যাবে, বাচ্চাটার অজানা হত্যাকারীকে শাপ-শাপান্ত করে যাবে। কিন্তু কেয়ামতের দিনে যখন এসব গায়েব তাদের কাছে প্রকাশ করা হবে, তখন সেই তারাই অনেক বেশি কৃতজ্ঞ থাকবে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার উপর।

সত্যি বলতে কী, এই ব্যাপারটা সবচেয়ে কঠিন লাগে আমার কাছে। কারণ সম্ভবত নিজেদের বুদ্ধির উপর আমাদের অতিরিক্ত আস্থা! আমরা খুব বুঝতে চাই কেন এমন হল! আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের মৃত্যুর খবর পেলাম, আমি অনেক কেঁদেছিলাম। আমার খালি মনে হচ্ছিল কেন এত তাড়াতাড়ি! ওনার যে ভদ্র ব্যবহার, যেভাবে উনি এত সুন্দর করে কোন কিছু

ব্যাখ্যা করতেন, এমন লোকের বড্ড অভাব আমাদের এখন। তখন এই কাহিনী থেকে আমি প্রবোধ পেয়েছি যে কিছু ঘটনার প্রজ্ঞা আমি হয়তো এই জীবনে টেরই পাবো না।

দ্বিতীয় কাহিনী থেকে আমাদের আরো একটা বিশাল জিনিস শেখার আছে। জিনিসটা একটু তাত্ত্বিক, আমি চেষ্টা করবো সহজভাবে বুঝাতে ইনশাল্লাহ।

এই কাহিনীর বাচ্চাটা যদি পরকালে দাবি করে যে আমি অবাধ্যতা বা কুফরী করতাম তার গ্যারান্টি কী, আমাকে তো নাবালক অবস্থায় খিদির আলাইহিস সালাম হত্যা করেছেন, তখন সেটার কী জওয়াব হবে? এটা আসলে আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন যে যারা কখনো ইসলামের দাওয়াত পায়নি বা প্রতিবন্ধী বা নাবালক তাদের হিসাব কিভাবে হবে? এ ব্যাপারে আমাদের ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি জানা দরকার-

১) আল্লাহ Counterfactual জানেন ২) কিয়ামতের দিন আল্লাহ কোনো জুলুম করবেন না।

একটু জটিল লাগছে? আল্লাহ Counterfactual জানেন মানে হচ্ছে কী হলে কী হত এটা আল্লাহ জানেন। অর্থ্যাত এই বাচ্চাটা বড় হয়ে কী করতো এটা আল্লাহ জানেন যদিও সে আসলে সেই আয়ূ পায় নাই।

আর আল্লাহ কারো উপর কোনো জুলুম করেন না মানে হচ্ছে যারা অবিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যু মারা গিয়েছে, তারা যদি আরো ৭০/৮০ বছর বাঁচতো তাহলেও ইসলাম গ্রহণ করত না। যারা সময় ও সুযোগ পেলে ইসলাম গ্রহণ করবে তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা দীর্ঘ আয়ু দেন। এর সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছে বদরের যুদ্ধে মারা যাওয়া কাফিররা। উমাইয়া বিন খালাফ, আবু জাহাল প্রমুখমুসলিমদের সাথে প্রথম মোকাবেলায় মারা গিয়েছে। কারা মারা যাননি? আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। এরা যখন সময় পেয়েছে, মক্কা বিজয় দেখেছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবু তালিব, আবু জাহল, এরা যদি মক্কা বিজয় দেখতোও তবু ইসলাম গ্রহণ করতো না। আল্লাহ এসব Counterfactual ব্যাপার জানেন। এর আগে আমরা বলেছিলাম যে আল্লাহই সময় ও স্থানের স্রষ্টা, তাই উনি এ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে, এই ব্যাপারটা সেই আলোকে দেখলে বোঝা সহজ হয়ে যায়। Counterfactual টার্মটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে।

এখন আল্লাহ অবশ্যই এই Counterfactual দিয়ে কিয়ামতের দিন বিচার করবেন না।যদি তা হত তাহলে তো আমাদের দুনিয়াতেই পাঠানোর দরকার হত না, কে দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে আর কে খারাপ, সেটাতো আল্লাহ জানেনই। যেহেতু Counterfactual, তাই মানুষ দাবী করতেই পারে যে আপনি যে ঠিক বলছেন সেটার গ্যারান্টি কী। এ ব্যাপারে আসলে খুব সুস্পষ্ট হাদিস আছে যা আমরা অনেকেই জানিনা।

চার প্রকারের লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করবে। প্রথম হলো বধির লোক, যে কিছুই শুনতে পায় না। দ্বিতীয় হলো সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল লোক, যে কিছুই জানে না। তৃতীয় হলো অত্যন্ত বৃদ্ধ, যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। চতুর্থ হলো ঐ ব্যক্তি, যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোনো নবী আগমন করেননি বা কোনো ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিলো না। বধির লোকটি বলবে, "ইসলাম এসেছিলো, কিন্তু আমার কানে কোনো শব্দ পৌঁছেনি"। পাগল বলবে, "ইসলাম এসেছিলো বটে, কিন্তু আমার অবস্থা তো এই ছিলো যে শিশুরা আমার ওপর গোবর নিক্ষেপ করতো।" বৃদ্ধ বলবে, "ইসলাম এসেছিলো, কিন্তু আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিলো, আমি কিছুই বুঝতাম না।" আর যে লোকটির কাছে কোনো রাসুল আসেনি এবং সে তাঁর কোনো শিক্ষাও পায়নি সে বলবে, "আমার কাছে কোনো রাসুল আসেননি এবং আমি কোনো সত্যও পাইনি। সুতরাং আমি আমল করতাম কীভাবে?" তাদের এসব কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দেবেন— "আচ্ছা যাও, জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ো।" রাসুল (□) বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তারা আল্লাহর আদেশ মেনে নেয় এবং জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ে, তবে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য ঠাণ্ডা আরামদায়ক হয়ে যাবে।" অন্য বিবরণে আছে যে, যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তা তাদের জন্য হয়ে যাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা বিরত থাকবে, তাদের হুকুম অমান্যের কারণে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসনাদ আহমাদ, তাফসির ইবন কাসির তাফসির, সূরা বনী ইসরাইল ১৫ নং আয়াতের তাফসির। ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া যাহলী (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়াতে নবীশূন্য যুগের লোক, পাগল ও শিশুর কথাও এসেছে)

এই হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে কিয়ামতের দিন কোনো জুলুম করা হবে না যেটা আল্লাহ কুরআন বহুবার উল্লেখ করেছেন (সুরা কাহফ ১৮:৪৯ অনেকগুলো উদাহরণের একটি।)

এই Counterfactual এর টপিক নিয়ে কথা বললে আর কথা শেষ হবে না। ফিরে আসছি দাজ্জালের ফিতনার প্রসংগে। জীবনটাতো মূসা আলাইহিস সালাম ও খিদির আলাইহিস সালাম এর কাহিনীর লেন্স দিয়ে দেখার চেষ্টা করা হল, কিন্তু দাজ্জালের সাথে এটার সরাসরি সম্পর্কটা কী?

১৪তম পর্ব

মূসা আলাইহিস সালাম ও খিদির আলাইহিস সালাম এর এই একত্রে পথ চলার কাহিনীকে এক কথায় প্রকাশ করলে কী দাঁড়াবে ব্যাপারটা? আমার কাছে মনে হয়- 'সাদা চোখে আমরা যা দেখি, তার বাইরেও একটা জগত আছে, যা আমাদের বুঝের বাইরে।' এটাই সম্ভবত জ্ঞানের ফিতনার সবচেয়ে বড় দিক- আমি যতই জ্ঞান অর্জন করি না কেন, আমার ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার বাইরে যেতে পারবো না, একটা জায়গায় গিয়ে আমার থামতে হবে এবং আস্থা রাখতে হবে আমাদের রাবের উপর।

কিন্তু এটার সাথে দাজ্জালের সম্পর্ক কী?

বলেছিলাম না যে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন এখানেই আছে? আসুন দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসের নিচের অংশটি পড়ি-

হুযাইফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দাজ্জালের সাথে কি থাকবে, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত অবগত আছি। তার সাথে প্রবাহমান দু'টি নহর থাকবে। একটি দৃশ্যত ধবধবে সাদা পানি বিশিষ্ট এবং অপরটি দৃশ্যত লেলিহান অগ্নির মতো হবে। যদি কেউ সুযোগ পায় তবে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত অগ্নি মনে হবে এবং চক্ষু বন্ধ করতঃ মাথা অবনমিত করে সে যেন সেটা থেকে পানি পান করে। সেটা হবে ঠান্ডা পানি। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)

কী বুঝলাম?

যা সাদা চোখে দেখা যায়, তার উপর ভরসা করলেই দাজ্জালের ফিত্নায় ফেল করে যাবো আমরা। আর এটাই সম্ভবত জ্ঞানের ফিত্নার মূল কথা- চর্মচক্ষু দিয়ে যা দেখা যায়, তার বাইরেও যে একটা জগত আছে, সেটাকে চিনতে শেখায় না যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই হল ফিতনা। আর দাজ্জাল

আমাদেরকে এই ফিত্নার দিকেই ডাকবে। কারণ দাজ্জালের এক চোখ হচ্ছে কানা। এ ব্যাপারে নিচের হাদীসটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে-

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, তোমাদের প্রভু কানা নয়, আর দাজ্জাল কানা হবে। তার ডান চোখ কানা হবে, তার চোখটি যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর। (রিয়াদুস সলেহিন, বিবিধ,২১০)

আচ্ছা এই কথাটার মানে কী যে দাজ্জাল কানা কিন্তু আল্লাহ কানা নন? আমরা দৈনন্দিন জীবনে এখন যেই জ্ঞান অর্জন করি সেটা কি আমাদের এক চোখা করে গড়ে তোলে নাকি না?

আমরা সবাই নিশ্চয়ই এক বাক্যে স্বীকার করবো যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে সামগ্রিক চিত্র দেখতে শেখায় না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি সব সময়ই এমন ছিলো?

উত্তর হচ্ছে না।

তাহলে আমরা কিভাবে আজকের অবস্থায় পৌঁছালাম? সেটা জানতে হলে আমাদের একটু ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। (এখানে উল্লেখ্য যে আমরা বিবর্তনের যে ক্রম দেখাবো সেটা অবশ্যই এক ধরণের অতি সরলীকরণ, এটা লেখা হয়েছে বায়্যিনাহ টিভিতে উস্তাদ নুমান আলী খানের সূরা কাহফের উপর লেকচার সিরিজ অবলম্বনে। ইতিহাসে যে কোনো বড় পরিবর্তনের পেছনে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। যে যেই ফিল্ডের এক্সপার্ট, সে সেই আলোকে ব্যাখ্যা করেন-যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা দিক থাকে। তাই ঘটনাটা এভাবেই ঘটেছে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই, আমরা শুধু একটি দিক উল্লেখ করছি মাত্র)

ঈসা (আঃ) এর প্রায় ৬০০ বছর পর রাসূল (সাঃ) পৃথিবীতে আসেন।রাসূল (সাঃ) এর সময় পৃথিবীর দুইটা বড় পরাশক্তি ছিল রোমান সম্রাজ্য ও পারস্য সম্রাজ্য। রোমান সম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।একটা হচ্ছে ইস্টার্ন ইউরোপ যেটার রাজধানী ছিল কন্সট্যান্টিনোপল (বর্তমানে তুরস্কের ইস্তাম্বুল)।আরেকটা ছিল ওয়েস্টার্ন ইউরোপ।প্রথম দিকে রাষ্ট্রপরিচালনার সুবিধার্থে এভাবে ভাগ করা হয়েছিলো।কিন্তু পরবর্তীতে এটার সাথে রাজনৈতিক ব্যাপার জড়িয়ে যায়। ইস্টার্ন ইউরোপ ছিল অর্থোডক্স খিস্ট্রানদের দখলে এবং ওয়েস্টার্ন ইউরোপ ছিল রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের দখলে।এদের মধ্যে বিশ্বাসগত বিশাল পার্থক্য ছিল।এমনকি তাদের ভাষাও আলাদা ছিল।অর্থোডক্স চার্চের ভাষা ছিল গ্রীক আর ক্যাথলিক চার্চের ভাষা ছিল ল্যাটিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাহাবীরা যখন ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু করেন তখন পারস্য সম্রাজ্য মুসলিমদের হাতে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। আর রোমান সম্রাজ্যের একটা বড় অংশ মুসলিমরা জয় করতে পেরেছিলো ঠিকই কিন্তু পুরো রোমান সম্রাজ্য তারা জয় করতে পারেনি। ইস্টার্ন ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলই মুসলিমরা জয় করে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ইউরোপের খুব বেশি অংশ তারা জয় করতে পারেনি।

এখন আপনি যদি পাশ্চাত্যের কোথাও কোনো Standard History কোর্স করেন তাহলে দেখবেন যে তারা Dark Ages/ Middle Ages (অন্ধকার যুগ) নামে পুরো একটা অধ্যায় পড়ায়। সেই সময়ে ইউরোপ যে কত পশ্চাৎপদ ছিলো সেটা তারা সবিস্তারে তুলে ধরে। আমরা বাংলায় যে 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' টার্মটা ব্যবহার করি, সেটাও এই সময়ের দিকে নির্দেশ করে। তারপর তারা পড়ায় যে রেঁনেসা ঘটেছিলো এবং ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ঘটেছিলো। এত সুন্দর করে কোর্সগুলো ডিজাইন করা হয় যে আপনার মনে প্রশ্নই আসবে না যে এই রেঁনেসাটা হয়েছিলো কিভাবে। যদি আগে থেকে সামগ্রিক ইতিহাস আপনার জানা থাকে, একমাত্র তখনই আপনি অসংগতিগুলো ধরতে পারবেন। আমার মনে আছে যে আমার পিএইচডির ১ম বর্ষে History of Economic Thought একটা কোর্স ছিলো যেখানে ওয়েস্টার্ণ ইউরোপের Middle Age এই চিরাচরিত গান ক্লাসে গাওয়া হচ্ছিলো। গ্রিক, এরিস্টটল.....তারপর Middle Age, তারপর রেঁনেসা ইত্যাদি। আমি একদিন সহ্য করতে না পেরে ক্লাসেই প্রফেসরকে বললাম যে আচ্ছা এই Middle Age এ তো ওয়েস্টার্ন ইউরোপের এহেন দশা ছিলো বলছো, ইস্টার্ন ইউরোপ কেমন করছিলো? প্রফেসর হেসে বললো It was doing good. আমি আর কথা বাড়ালাম না, যদিও মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলো যে সেটার ইতিহাস পড়াবা না?

এখানে একটা শুভংকরের ফাঁকি আছে। আমরা মুসলিমদের স্বর্ণযুগ বলে যেটাকে জানি, মুসলিমরা যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের শীর্ষে অবস্থান করছিলো, সেই সময়টা আর ওয়েস্টার্ন ইউরোপের এই Dark Age একই সময়!

বিশ্বাস হয়?

হুম, পশ্চিমারা যখন ইতিহাস পড়ায় তখন সুকৌশলে মুসলিমদের এই টকটকে সোনালী ইতিহাসকে গোপন করে।মুসলিমরা যে শত শত বছর পৃথিবীকে শাসন করেছে, তারা যে একটা

বিশাল পরাশক্তি ছিল এটা একদমই এড়িয়ে যায়। আমরা সেটা টের পাই না কেন? ওদের একটা খুবই কার্যকরী কৌশলের কারণে। কী সেটা?

নাম পরিবর্তন।

তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের নামগুলো বিকৃত করে ফেলেছে।আপনি যদি স্পেনের ইতিহাস পড়েন দেখবেন ওদের ইতিহাসে মুরদের শাসনামলের কথা বলা আছে। এই মুর কারা? মুসলিমরা।আপনি কি মুর শুনে একবারও বুঝবেন এখানে মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে? বোঝা সহজ নয়। আবার মুসলিমদের ইস্টার্ন ইউরোপ শাসনের এই সময়টা নিয়ে আপনি যদি পড়তে চান, আপনি বুঝেই উঠতে পারবেন না যে আপনাকে কোন কোর্স নিতে হবে। সেই সময়ের নাম ওরা দিয়েছে Late Antiquity! আরেকটা জিনিস লক্ষ করবেন ওরা কিন্তু কখনো মুসলিম বলে না ওরা বলে আরব।ইসলামকে ওরা একটা আরবীয় জিনিস বানিয়ে দিয়েছে।

যাই হোক, আমরা আগে বলেছি যে ওয়েস্টার্ন ইউরোপ ছিল রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের দখলে। আমরা এর আগে গুহাবাসীর কাহিনী বলার সময় ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা বিকৃত হওয়ার কাহিনী কিছুটা বলেছিলাম। ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে একদমই সম্পর্কহীণ রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাসের মূলনীতিগুলো ছিলো-

১.ত্রিতত্ত্ববাদ।

২.স্রষ্টা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলো।

৩.যিশু মানবতার ভালোবাসায় নিজের জীবনকে উৎসর্গিত করেছে।

৪.যে বিশ্বাস করবে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সকলের পাপ মোচন করে দিয়ে গেছে সে পরকালে নিশ্চিন্তে থাকবে।

তবে শুধু এগুলোই না, তারা আরো কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলো। কী সেটা?

১৫তম পর্ব

আমরা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি যে কিভাবে আমরা একটা একচোখা শিক্ষাব্যবস্থায় পৌঁছালাম। আগের পর্বে উল্লেখিত অদ্ভূত থিউরীগুলোকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা আরো যেসব বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলো সেগুলো হচ্ছে-

১.সাধারণ মানুষ বাইবেল পড়তে পারবে না।এ ক্ষমতা শুধুমাত্র চার্চেরই আছে।

২.কেউ বাইবেল থেকে কোন রেফারেন্স দিতে পারবে না।

৩.সাধারণ মানুষ বাইবেলের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবে না।শুধুমাত্র পোপই এটা করার ক্ষমতা রাখে।

৪.পোপের ভুল হলেও সেটা ধরা যাবে না।কারণ পোপ মাত্রই নির্ভুল।

৫.বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা করা যাবেনা। কারণ যুক্তি শয়তানের থেকে আসে।

৬.পোপের পাপ মোচন করার ক্ষমতা আছে

৭.যদি কেউ চার্চের কোন কার্যক্রম অসত্য বলে মনে করে তাহলে সে বিপথগামী হয়ে যাবে।মৃত্যুর পর চার্চ তার মৃতদেহ সমাহিত করবে না।

আপনাদের কাছে কী মনে হয়? এই অতিরিক্ত নিয়ম কানুনগুলোর কেন দরকার ছিল? এটা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে স্পষ্ট যে প্রথমে উল্লেখিত চারটি মূলনীতির কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি ছিলো না। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে মানুষ হচ্ছে আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি, আপনি যদি মানুষকে তার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা, বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতুহল এসব থেকে থেকে দমিয়ে রাখতে চান, তখন আপনার মানুষকে তার পরিবর্তে কিছু দিতে হবে- হয় লোভ দেখাতে হবে, নাহয় ভয় দেখাতে হবে।

খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে সেটার দুইটাই করা হয়েছে। লোভ দেখানো হয়েছে এটা বলে যে পোপ পাপগুলো ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে। এই বিশেষ ক্ষমতা যার আছে তাকে আনুগত্য করবেন না আপনি? আর ভয় কিভাবে দেখানো হয়েছে? লাশ সমাহিত করা হবে না বলে। করোনার সময়ে আমরা টের পেয়েছি না যে এই ব্যাপারে আমাদের কী তীব্র ভয় কাজ করে? আমরা কেউ এমন নিঃসংগ মৃত্যু চাই না যখন সামাজিক কাজগুলো করা হচ্ছে না।

আচ্ছা আমরা আমাদের বর্তমান সময়ের সাথে এটার কোনো মিল পাই? এই যে আমরা মুসলিমরা এখন চিন্তা ভাবনার দৈন্যতাতে ভুগি, তার একটা কারণ কিন্তু আমাদেরকে এখন অনেক বেশি ভুলিয়ে রাখা হয়। আমার এক ফ্রেন্ড- পাবলিক পলিসি, সোশোলজি- এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছে, সে আমাকে বলছিল- যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত এখন এত পরিমাণে উৎসব পালন করে, এই জিনিসটা আগে ছিল না। মানুষজন এখন কিছু হলেই বাইরে খেতে যায়। তাছাড়াও সাজগোজ,

বিলাসিতা আর শো অফ এর প্রবণতা এখন আমাদের মাঝে মজ্জাগত হয়ে গেছে। এগুলো আসলে মানুষের জৈবিক স্বত্ত্বাকে feed করানোর কৌশল। আর সাথে খুন, গুম, ক্রসফায়ার এগুলোর ভয়তো আছে। সব মিলিয়েই আমরা একটা নপুংসক জাতিতে পরিণত হয়েছি।

যাই হোক, আমরা যদি এই উল্লিখিত নীতিগুলোর আলোকে ধর্মকে চিন্তা করি যেখানে সাধারণ মানুষ বাইবেল পড়তে পারে না, একমাত্র পোপই বাইবেল ব্যাখ্যা করতে পারে তখন সেই পোপ শ্রেণী যে চরম ক্ষমতাধর হবে এবং সেটা কাজে লাগিয়ে শোষণের চূড়ান্ত করবে সেটাতো স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয়। এই শোষণের স্বরূপ বুঝতে হলে আপনি Indulgence শব্দটা দিয়ে ইন্টারনেটে সার্চ দিতে পারেন বিস্তারিত জানার জন্য- রোমান ক্যাথলিক চার্চ এগুলো বিক্রি করতো, যার ফলে গ্যারান্টি দেয়া হত যে তাদের পাপের শাস্তি কম হবে। এভাবে পোপ শ্রেণী তখন শুধু ক্ষমতাধরই না, বিশাল ধনীও হয়ে গিয়েছিলো।

আপনারা হয়তো বা শুনেছেন কার্ল মার্ক্স এর সেই বিখ্যাত উক্তি যে ধর্ম একটা আফিমের মতো যেটা খাইয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা হয়। আমরা কি বুঝতে পারছি যে কোন পটভূমিতে সে এই উপসংহারে পৌঁছিয়েছিলো? তাকে খুব কি ভুল বলা যায়?

আমরা হয়তো বা সবাই কোপার্নিকাসকে হত্যা (কারণ সে বলেছিল পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে) বা গ্যালিলিওকে হত্যার হুমকি দেয়ার (কারণ সে কোপার্নিকাসের থিওরিকে সমর্থন করে প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলো) কাহিনী জানি। সেগুলো এই সময়েরই কাহিনী যখন বিজ্ঞানকে দমিয়ে রাখা হতো। আপনাদের কাছে কী মনে হয় যে কেন এমন করা হত?

চার্চ কিংবা পোপ এটা ভালো করে বুঝতে পেরেছিল যে বিজ্ঞানমনস্কতার নিশ্চিত ফলাফল হচ্ছে মানুষের মাঝে স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হবে, আর সেটা তখন শুধু এসব জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তারা প্রশ্ন করা শুরু করবে পোপ কে? ট্রিনিটি মানে কী? স্রষ্টা কিভাবে একজন মানুষ হন? আর তা যদি হয় তবে চার্চের এই অবাধ কর্তৃত্ব চলে যাবে। তবে এই বিজ্ঞান চর্চাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য ওরা খুবই সুন্দর একটা কৌশল প্রয়োগ করেছিলো- ধর্মীয় কৌশল অবশ্যই, সেটা হল যে এই দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে অভিশপ্ত- আদি পাপের কারণে (আদি পাপ হচ্ছে, আদম আলাইহিস সালাম এর পাপের কারণে আমরা দুনিয়াতে আসছি এই চিন্তা, ইসলাম ধর্মে যেটার কোনো ভিত্তি নেইএরকম কিছু নেয়)। তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা যাবে না, এটা করা যাবে না ,ওটা করা যাবে না, মানে কোন মতে এই জীবনটা কাটিয়ে দিতে

হবে, আসল উদ্দেশ্য হবে পরকাল। পরকালে গুনাহ মাফের জন্য বিশ্বাস করতে হবে যে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, তাহলেই আমি জান্নাতে যেতে পারবো।

আচ্ছা আমরা কি আজকাল আমাদের মাঝে এমন অনুরূপ প্রবণতা দেখতে পাই দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষা এই লেবেলের মাধ্যমে? চিন্তার অনুরোধ রইলো।

যাই হোক, আমরা অনেকেই হয়তো ক্রুসেডের নাম শুনেছি, সেটাও এই সময়ের কাহিনী। ওয়েস্টার্ন ইউরোপের পোপেরা ক্রুসেডের ডাক দিয়েছিলো। তারা এটাকে ধর্মযুদ্ধ নাম দিয়েছিলো কারণ তারা একে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের মিশন হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো যেটা ছিলো মুসলিমদের দখলে (উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়েই জেরুজালেম মুসলিমদের দখলে আসে)। কিন্তু আদতে ওদের প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক।কারণ ওয়েস্টার্ন ইউরোপের অবস্থা ছিল চরম বাজে এবং এজন্য ইস্টার্ন ইউরোপের প্রতি তাদের একটা বিরাট ফ্যান্টাসি ছিল, আমাদের বাঙালিদের আমেরিকা বা বিদেশে প্রতি যেমন একটা ফ্যান্টাসি কাজ করে অনেকটা তেমন।

আমরা জানি যে ক্রুসেড তিনটা ধাপে হয়েছিলো। প্রায় ৯৫ বছর জেরুজালেম খ্রিস্টানদের দখলে ছিল। তারপর সালাউদ্দিন আইয়ুবী পুনরায় জেরুজালেম জয় করে নিলেন। কিন্তু এর মাঝে ঘটে যায় আরো অনেক ঘটনা, আমরা আস্তে আস্তে সেগুলোর উপর আলোকপাত করবো ইনশাল্লাহ।

তার আগে একটু বলে নেই যে আমাদের হয়তো মনে হবে যে এসব ইতিহাস এখন পড়ে লাভ কী আর এটার সাথে সূরা কাহফেরই বা সম্পর্ক কী। সম্পর্কটা আসলে খুবই গভীর! আমরা খুব শীঘ্রই এটা বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ।

আপনি আজকের যত নাস্তিক্যবাদের ব্লগ, লেখা পড়বেন, সবখানে দেখবেন যে তারা এই মধ্যযুগে ধর্মের নামে ব্যবসার আদ্যপান্ত বর্ণনা করে, তারপর বুঝাতে চায় যে সব ধর্মই এক, তারপর কাল্পনিক একটা সংঘাত দাঁড়া করায় ইসলাম ও বিজ্ঞানের মাঝে।

কিন্তু আদতে কি কোনো সংঘাত আছে বিজ্ঞান ও ইসলামের মাঝে?

১৬তম পর্ব

মনে আছে যে এবার করোনার সময়ে নাস্তিক্যবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদন যখন শুন্যের কোঠায় তখন ওরা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটা অদ্ভুত কবিতা প্রচার করা শুরু করলো যে ‘যদি বেঁচে যাও .....জেনো বিজ্ঞান লড়েছিলো মসজিদ মন্দির নয়?’ গত পর্বে বলেছিলাম যে এদের

একটা সাধারণ কৌশল হচ্ছে ইসলামকে আর সব ধর্মের সাথে একই কাতারে ফেলা? এখানে ঠিক এই কাজই করা হয়েছে। তারা দাবী করতে চায় যে ইসলাম আর বিজ্ঞানের মাঝে একটা সংঘর্ষ আছে। তাদের এই দাবী সত্যি নাকি সেটা বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে এই তথকথিত অন্ধকার যুগে ইস্টার্ণ ইউরোপের অবস্থা। আমাদের জানতে হবে ওয়েস্টার্ন ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে রেঁনেসার সূচনা কিভাবে হয়েছিলো।

তবে তার আগে একটা সহজ দাওয়াহ টিপস দিয়ে নেই। যাদের ইসলাম নিয়ে অনেক চুলকানী আছে, তাদের সাধারণত প্লেটো, এরিস্টটল, এদেরকে অনেক ভালো লাগে। তাদেরকে প্রশ্ন করবেন যে ভাই এনাদের লেখাগুলো বিশ্বের মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছলো?

আগের একটা পর্বে বলেছিলাম না যে আমার পিএইচডিতে একটা কোর্স ছিলো অর্থনীতির ইতিহাসের উপর? প্রফেসর যখন গদ্গাদ হয়ে এরিস্টটল পড়াচ্ছিলেন, তখন আমি তাকে কী যেন একটা টপিক নিয়ে (এখন আরে মনে নাই) জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আচ্ছা এই ব্যাপারে এরিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন স্ববিরোধী লাগে না? সে তখন ডিফেণ্ড করার জন্য বলেছিলো যে আসলে আমরা তো এরিস্টটলের মূল লেখাটা আর পাই না, সেটা তো হারিয়ে গেছে এখন। আমরা যেটা পাই সেটা অনেকবার অনুবাদের ফল। গ্রীক থেকে আরবী, আরবী থেকে ল্যাটিন, ল্যাটিন থেকে ইংরেজী.....এত ধাপ পেরিয়ে আসাতে এমন লাগতে পারে।

আমি আর কথা বাড়াই নাই। সে যে ধাপগুলোর ব্যাপারে সত্যি বলেছিলো, এতেই আমি তখন খুশী হয়ে গিয়েছিলাম।

জ্বী পাঠক, আপনি হয়তো ঠিকই খেয়াল করেছেন যে এই লেখাগুলো সংরক্ষিত হয়েছে/ আমরা আজকে হাতে পাচ্ছি কারণ মুসলিমরা এগুলো গ্রীক থেকে আরবীতে অনুবাদ করেছিলো!

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই মুসলিমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যে জাতির উপর প্রথম ওহী ছিলো ‘পড়ো’, তাদেরতো এমনই হওয়ার কথা তাই না? মুসলিম খলীফারাও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খলিফা হারুন অর-রশিদের পুত্র আল-মামুনের সময় ৮৩০ সালে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র বাইতুল হিকমাহ। এমন অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। এই আব্বাসীয় খিলাফতের সময়েই মুসলিমরা তাদের অনুসন্ধিৎসু মন থেকেই এসময় গ্রীক দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী হয়। তারা গ্রীক ভাষা শিখেছিলো এগুলো নিয়ে জানার জন্য এবং আরবীতে অনুবাদও করেছিলো। তারপর ওয়েস্টার্ণ ইউরোপের জ্ঞান পিপাসু কিছু মানুষ, যাদেরকে হত্যার হুমকি দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হতো,তারা

পালিয়ে ইস্টার্ন ইউরোপে চলে এসেছিল। সেখানে এসে তারা দেখল এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিবেশ, এখানে মানুষ পড়াশোনা করছে, বিজ্ঞান ধর্মের কোন কনফ্লিক্ট নেই। তখন তাদের মধ্যে একটা প্রবণতা আসলো, তারা তাদের ভাষায় তথা ল্যাটিনে, বিভিন্ন বই আরবি থেকে অনুবাদ করল। অর্থাৎ মুসলিমদের অবদান না থাকলে প্রিয় প্লেটো, এরিস্টটল, এদের মতবাদ পড়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনোটাই মানুষের হত না।

ইতিহাস পড়ানোর সময়ে ওয়েস্টার্ন ইউরোপে রেনেসাঁ ও এর পরবর্তী সময় মহা সমারোহে পড়ানো হয়। যেটা পড়ানো হয় না সেটা হল রেনেসাঁ কিভাবে হল। আরো একটা বিশাল অন্যায় তারা করে- মুসলিমদের থেকে শেখা জিনিসকে তারা বেমালুম নিজেদের দাবি হিসেবে চালিয়ে দেন যে তারাই এটা প্রথম আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপ যখন মুসলিমরা শাসন করছিল, তারা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে ছিল, এসব নিয়ে কাজ করে গেছে অলরেডি, সেটার ইতিহাস তারা বেমালুম চেপে যায়। যখন একেবারেই পারেনা, তখন ওই আবিষ্কর্তার নামটা বদলে দেয়। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে অ্যাভিসিনা এর বই পড়া হয়। এই অ্যাভিসিনা যে ইবনে সিনা এটা অনেকেই জানেনা। কিংবা আলজিবর থেকে যে অ্যালজেবরার উৎপত্তি তাও অনেকের জানা নেই।

যাই হোক, ক্রিস্টানরা যখন ল্যাটিন তথা সাধারণ মানুষের ভাষায় বিভিন্ন বই অনুবাদ করা শুরু করলো তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা কী অনুবাদ করলো বলে আপনার মনে হয়?

জ্বী, ঠিকই ধরেছেন, বাইবেল। এই যুগান্তকারী কাজটা করেন মার্টিন লুথার কিং। কেন এটাকে যুগান্তকারী বলছি? আপনাদের আগেই বলেছিলাম যে তখনকার সময়ে সবার বাইবেল পড়ার অনুমতি ছিলো না। এটা সম্ভবপর হয়েছিলো ভাষাগত পার্থক্যের কারণে।

মার্টিন লুথার কিং যখন বাইবেলকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করল তখন দেখা গেল যে পাদ্রীরা এতদিন তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে এসেছে, তারা যেগুলোকে ক্রিস্ট ধর্মের মূলনীতি হিসেবে তুলে ধরেছে সেগুলো কিছুই আসলে বাইবেলে নেই।

এইসময়ে আরো বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন ঘটে-ছাপাখানার আবিষ্কার হয়। ফলে অনুবাদকৃত বাইবেল ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় ছাপাখানার মাধ্যমে। শুরু হয় ঐতিহাসিক প্রোটেস্ট্যান্ট মুভমেন্ট। এটাকে প্রোটেস্ট্যান্ট মুভমেন্ট কেন বলে? কারণ এটার শুরুই হয়েছিলো প্রোটেস্ট তথা প্রতিবাদের মাধ্যমে। মিথ্যার বেসাতি গড়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ধার্মিক সম্প্রদায়ের প্রতি চরম একটা বিতৃষ্ণা জন্ম নিলো, আর সেটার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা ইউরোপে বিশাল এক পরিবর্তন আসলো যেটার তিনটা দিক ছিলো-

১) **আত্মার বদলে শরীর** (Body over soul)

এতদিন ধরে গীর্জা যে জীবন ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলো, সেটার ফোকাস ছিলো আত্মা। প্রশ্ন করা যাবে না, যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করা যাবে না...ইত্যাদি নানা বিধি নিষেধ। কেন? এগুলো তোমার আত্মাকে কলুষিত করবে। শুধু বিশ্বাস, শুধুই ভালোবাসা। তারা দাবী করেছিলো যে কোপারনিকাসকে পুড়িয়ে হত্যার মাধ্যমে এ জীবনে ওকে শাস্তি দিয়ে পরকালে আত্মাকে বাঁচানো হলো। মানুষ ভাবা শুরু করলো যে অনেকদিন তো হল আত্মা নিয়ে গবেষণা! করে কী পেলাম? কিছুই না। বরং ওরা পূর্ব ইউরোপে গিয়ে দেখলো যে তার চেয়ে যদি শরীর নিয়ে গবেষণা করা হয় তাহলে চিকিৎসা বিভাগের উন্নতি হবে, জীবন সম্ভাবনা বাড়বে, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবো যা আগে অকল্পনীয় ছিল। অতএব আত্মা নিয়ে চিন্তা ভাবনা বাদ! ফোকাস হবে শুধুই শরীর।

২) **অদেখা ঈশ্বরের বদলে এই বাস্তব বিশ্ব** (Physical Universe over God)

চিন্তার প্যাটার্ণটা আগের মতই। ঈশ্বর এক নাকি তিন নাকি তিনের এক, মানুষ হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্য করেছেন কী করেন নাই, এসব তো অনেক হল, এখন মনোযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দু হোক বাস্তব বিশ্ব। জোত্যির্বিজ্ঞান, রাত দিনের আবর্তন, পানি চক্র এগুলো সব নিয়ে গবেষণা শুরু হোক। আমি ধর্মে বিশ্বাস করি কি না করি, আমি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করি কি না করি এটা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ না।

৩) **পরকালের বদলে দুনিয়া** (This life over hereafter)

ত্রিত্ববাদ, আদি পাপ, প্রায়শ্চিত্য- সব কিছুর থিম ছিলো কিভাবে ওইপারে ভালো থাকা যায়। ফলাফল? অন্ধকার যুগের পশ্চাতপদতা। পরকালে কী হবে এটা নিয়ে এত চিন্তা করার দরকার নেই, তার চেয়ে আসো এই জীবনটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করি, পরকালের ব্যাপার মরার পরে দেখা যাবে।

আচ্ছা এই তিনটা দিকের মাঝে আমরা কি কমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি? এটার সাথে দাজ্জালের যে বৈশিষ্ট্যের নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেটার কোনো ইঙ্গিত কি খুঁজে পাচ্ছি?

১৭তম পর্ব

গত পর্বে প্রোটেস্ট্যান্ট মুভমেন্টের যে তিনটা দিক (Body over soul , Physical Universe over God, This life over hereafter) আমরা উল্লেখ করেছিলাম সেগুলোর একটা কমন

থিম হচ্ছে যা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু সেগুলোকেই গুরুত্ব দেয়া, দৃষ্টির বাইরে যে জগত আছে সেটাকে হিসাবের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া। এবার কি আমরা মুসা আলাইহিস সালাম ও খিদির আলাইহিস সালামের কাহিনীর সাথে এইসব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কোনো যোগসূত্র পাচ্ছি? দাজ্জালের সাথে?

যে তিনটা পরিবর্তনের কথা বললাম, সেগুলোর মাধ্যমে মানুষের মনোযোগের ফোকাস বদলে যাওয়ার সাথে সাথে আরো যে একটা বিশাল পরিবর্তন হয়ে যায় সেটা হল এত বছর ধরে যে একচেটিয়া ক্ষমতার মাধ্যমে গির্জা যে নীতি নৈতিকতার বলয় তৈরি করেছিল, সেগুলো সব খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। এখন যেহেতু চিন্তার দুয়ার আর বন্ধ নেই, তাই মানুষ ভাবতে থাকে যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা বের করার জন্য তাদের বিবেক বুদ্ধিই যথেষ্ট।

কিন্তু আসলে কি তাই? আসুন একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যেটা ডঃ বিলাল ফিলিপ্স প্রায়ই দিতেন উনার নানা লেকচারে।

প্রোটেস্ট্যান্ট মুভমেন্ট যেহেতু সব ধরণের প্রতিষ্ঠানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা শুরু করলো, তাই 'বিয়ে' নামক প্রতিষ্ঠানটাও বাদ রইলো না। তারা দাবী করা শুরু করলো যে বিয়ে একটা অর্থহীণ প্রথা, মূল পয়েন্ট হচ্ছে সম্মতি। তখন যে সমস্যাটা দেখা গেল যে শিশু যৌন নির্যাতন জাস্টিফাইড হয়ে গেল। বাচ্চা যেহেতু, বলাই যায় যে ওর সম্মতি ছিল। তখন আগের নিয়ম বদলে বলা হল যে সম্মতি হতে হবে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে। এরপর কী সমস্যা হলো?

দেখেন এখানে কিন্তু বলা হয় নাই যে তাদের ভিন্ন লিঙ্গ হতে হবে। এভাবে সমকামিতার রাস্তা খুলে গেল। প্রতিবাদ করার কোনো অবকাশ নেই কারণ সমকামিতা শুধু ধর্ম দ্বারাই নিষিদ্ধ আর ধর্ম তো এখন অচ্ছ্যুৎ টপিক! তাই আমরা দেখবো যে নাস্তিকরা সমকামিতার বিজ্ঞাপন করতে খুবই উৎসাহী।

এইভাবে উর্বর মস্তিষ্ক দ্বারা ন্যায় নীতির যে বোধ, সেটার আরেকটা ফলাফল হচ্ছে Incest Relationship. দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে সম্মতিই যদি যথেষ্ট হয় তাহলে বাবা-মেয়ে/ভাই-বোন/মা-ছেলে এসব সম্পর্ক হতে বাঁধা কোথায়? আস্তাগফিরুল্লাহ! এই ক্ষেত্রে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় থাকলো না যে কেন এটা ভুল। তাই নাস্তিকরা যখন বলে যে ধর্মের কোন দরকার নেই তখন তাদেরকে এই পয়েন্টে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে Incest Relationship কেন খারাপ।

এখানে উল্লেখ্য যে সমকামিতার মত এ ধরণের সম্পর্কের ব্যাপারে অনুভূতি শুন্য করাও ওদের এজেণ্ডার অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

আচ্ছা ওয়েস্টার্ণ ইউরোপের উপর রেঁনেসা বা পুনর্জাগরণের প্রভাব নিয়ে তো অনেক কথাই হল, এবার একটু তাকাই সমসাময়িক ইসলামী বিশ্বের দিকে? আমাদের তখন কী অবস্থা?

আমরা আগে বলেছিলাম যে আব্বাসীয় খিলাফতের সময়ে মুসলিমরা তাদের অনুসন্ধিৎসু মন থেকে গ্রীক দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী হয়। এভাবে জ্ঞানস্পৃহা থাকা অবশ্যই ভালো কিন্তু সমস্যাটা হল যখন তারা সীমারেখা মেনে চলতে পারলো না। তারা খুব বেশি এসব গ্রীক দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদিতে এবং ধীরে ধীরে তারা ওহী বা কোরআন-সুন্নাহ এর সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলল। আর এমনটা যখন হয়, তখন কী হয়? যারা 'শিকড়ের সন্ধানে' বইটা পড়েছেন তারা ভালো বুঝবেন যে বনী ইসরাঈলের কাহিনী থেকে আমি সেখানে বারবার এটা বুঝাতে চেয়েছি যে এটাই আল্লাহর নীতি-আমরা যখন আল্লাহর কালাম এর সাথে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলি, তখন বহিঃশত্রু আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না, মুসলিমরা ক্রুসেডে হেরে গেলো এবং প্রায় ৯৫ বছর জেরুজালেম আমাদের হাতছাড়া থাকলো। সমসাময়িক সময়েই মুসলিমরা মোঙ্গলদের কাছে হেরে যায়, আব্বাসীদ খিলাফতের পতন হয়। এই ঘটনাটাকেই বলা হয় Sack of Bagdad। আমাদের মুসলিমদের যে সুবিশাল জ্ঞানৈশর্য্য ছিলো, সেটার অধিকাংশ আমরা হারিয়ে ফেলি এই সময়। তাই বলা যায় মুসলিমরা যখন দুর্বল হয়ে গেল, তখনই ইউরোপে রেনেসাঁ সূচনা হলো এবং বিশ্ব মানচিত্রে পশ্চিমারা শক্তিশালী হতে থাকলো। মুসলিম ও পশ্চিমা বিশ্বের এই পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের ব্যাপারে মুসলিমদের মানসিকতার ভূমিকা নিয়ে ইয়াসির ক্বাদির একটা লেকচার আছে The rise and Fall of Muslim Ummah and the Printing Press. আগ্রহীরা শুনে দেখতে পারেন।

রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে মুসলিমদের সর্বশেষ অপসারণ ঘটে ১৯২২ সালে, উসমানী খিলাফতের পতনের মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মোটামুটি সবগুলো মুসলিম দেশই পশ্চিমা উপনিবেশে পরিণত হয়, জেরুজালেম মুসলিমদের হাতছাড়া হয়, সেখানে বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনাগুলোর ক্রম জানার জন্য আমি সবাইকে ইয়াসির কাদ্বীর একটা লেকচার শোনার অনুরোধ

করবো- 1914- the shape of the modern world। আমি খুব বিশ্বাস করি যে এটার বিষয়বস্তু আমাদের প্রত্যেকের জানাটা খুবই জরুরী।

মুসলিম দেশগুলো যখন পশ্চিমাদের কলোনীতে পরিণত হল, তখন মোটা দাগে ইসলামী স্কলারদের প্রতিক্রিয়া কী ছিলো?

তারা মনে করলেন যে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা টিকতে পারবে না, তার চেয়ে ভালো নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলে একটা দুর্গের মত তৈরি করে ফেলা যেটার মাঝে তারা নিজেরা ইসলামিক জীবন যাপন করতে পারবেন। সেই জগতে এই বহিরাগতদের কোন প্রভাব থাকবে না, ফলে বাইরের যে ফিতনা ফাসাদ আছে সেগুলো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।আমরা যদি ওদের সাথে মিশে যাই তাহলে আমরা আমাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবো।তাই ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা ইসলামের স্বকীয়তাগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টা করব।

তাদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো না ঠিক ছিলো সেই আলোচনায় আমি যাবো না, আমি শুধু কথা বলবো সেটার প্রভাব নিয়ে।

এভাবে একটা রক্ষাবুহ্যের মত তৈরি করে উম্মাহর কিছু অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা গেলো, কিন্তু বাকিদের কী হল?

ইসলামী পন্ডিত দের সাথে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল এবং তারা জ্ঞান অর্জন করতে থাকলো পশ্চিমা শক্তিদের থেকে। সেই শিক্ষার স্বরূপটা কেমন ছিলো সেটা কি আমাদের মনে আছে? আত্মার থেকে শরীর, সৃষ্টিকর্তার থেকে বাস্তব বিশ্ব আর পরকালের থেকে এই দুনিয়া বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম তখন আর কেন্দ্রবিন্দুতে নেই। কেউ মুসলিম, বৌদ্ধ নাকি খ্রিষ্টান তাতে কিছু যায় আসে না, সবাই একই শিক্ষা পাচ্ছে।

আচ্ছা আপনারা কি এমন মানুষ চিনেন যারা এহেন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে? না চিনলে একবার আয়নার দিকে তাকানো যেতে পারে!

১৮তম পর্ব

অধিকাংশ মুসলিমরা যখন পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছিলো তখন সেটার প্রভাবেই মুসলিমদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা, জাতীয়তাবাদী মানসিকতা সৃষ্টি হতে থাকে। আমরা যদি আমাদের

উপমহাদেশের ইতিহাসের দিকেই তাকাই, দেখবো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো কিন্তু মুসলিমদের দ্বারাই।ফকির বিদ্রোহ,তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার যুদ্ধ ইত্যাদিই এর প্রমাণ।লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বিদ্রোহগুলোতে আমরা কিন্তু হিন্দুদের খুব একটা দেখি না। কারণটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। অন্য ধর্মের মানুষদের সাধারণত নতুন কিছু একটার সাথে মানিয়ে নিতে তেমন কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু আমরা মুসলিমরা তা পারি না।কেন? কারণ আমাদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি আছে, জীবনধারা আছে, সেটার সাথে দেখা যায় প্রতি পদে পদে সংঘর্ষ হয়।

যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা লাভ করে। যখন রাজনৈতিক ভাবে মুসলিমরা ঔপনিবেশ থেকে মুক্ত হলো তখন উম্মাহর যেসব স্কলাররা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলো,এবার তারা বের হয়ে আসলো।কিন্তু দুভার্গ্য যে তারা এসে দেখলো উম্মাহর একটা বড় অংশ পুরোপুরি বদলে গেছে।আগে এসব স্কলাররা ছিল সমাজের শ্রদ্ধার এবং সম্মানের পাত্র। এবার তারা দেখলো যে সমাজের মানুষেরা আর তাদের সম্মান বা শ্রদ্ধা করছেনা।কিন্তু কেন এমন হলো?

কারণ ঔপনিবেশিক শাসকরা যখন চলে যাচ্ছিলো তারা একটা মারাত্মক কাজ করে গিয়েছিলো।তারা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো রেখে গিয়েছিলো।এর সবচেয়ে সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি আমাকে একটা মুসলিম দেশের উদাহরণ দেন যেখানে সুদভিত্তিক ব্যাংক নেই, তাহলে আপনারা কেউই উত্তর দিতে পারবেন না।কেন?কারণ এমন কোন মুসলিম দেশ বাস্তবে নেই-ই, অথচ সুদের কথা কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার সমতুল্য। ভাবা যায়?

মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিমা ধাঁচের রয়ে যাওয়াতেই রাজনৈতিক ভাবে মুসলিমরা উপনিবেশ থেকে মুক্ত হলেও চিন্তা চেতনায় তারা পশ্চিমাদের ধ্যান ধারণাই লালন করছিলো।মানুষের মধ্যে একটা ধারণা গেঁথে গিয়েছিলো যে কেন আমি সেই হুজুরদের শ্রদ্ধা করবো যারা পদার্থবিজ্ঞান জানে না, রসায়ন জানে না,গণিত বোঝে না বা চিকিৎসা শাস্ত্র জানে না,? এগুলোই তখন শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বিষয় হয়ে গিয়েছিলো। মানুষ এহেন শিক্ষাব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ ভাবছিলো। পক্ষান্তরে স্কলাররা ধরতেই পারছিলো না যে আসলে কী ঘটে চলছে।তাই তাদের কর্মপন্থা,তাদের বক্তৃতা বা লেখনী সেই আগের মতই রয়ে গেলো যদিও বা তাদের শ্রোতাদের চিন্তা ভাবনার জগতে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। ফলে সাধারণ মানুষদের সাথে হুজুরদের একটা অলিখিত

সীমা তৈরি হয়ে গেল যা আজো বিদ্যমান। মানুষ প্র্যাকটিসিং বা হুজুরদের পছন্দ করে না,সম্মান করে না, কারণ তাদের অধিকাংশেরই দুনিয়া সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।অন্যদিকে প্র্যাকটিসিং বা হুজুর সম্প্রদায় নিজেদের নিয়ে সুপারিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে যে তারা দ্বীনের অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। দ্বীন এবং দুনিয়ার মাঝে এই যে একটা শ্রেণীবিভাগ করতে পারা, এইটাই আমি বলবো পশ্চিমা উপনিবেশবাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে এটা উপলব্ধি করেছি। আমি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যার কাছে ইসলাম শিখি, তিনি ছিলেন একটা বুয়েট পাশ ইঞ্জিনিয়ার। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে বুয়েট থেকে পাশ করে কেউ আক্বীদা, ফিকহ, হাদীস শিখাচ্ছে এই ব্যাপারটাই আমাকে উনার কাছে দ্বীন শিখতে আগ্রহী করেছিলো। আইবিএ তে পড়া উন্নাসিক সেই আমি মাদ্রাসা পড়ুয়াদের ব্যাপারে একটা অনীহা অনুভব করতাম যেটা এখন পুরোপুরি কেটে গেছে আলহামদুলিল্লাহ।

মুসলিম দেশগুলো থেকে রাজনৈতিক ভাবে চলে গেলেও চিন্তাচেতনায় আমরা যে আজো পশ্চিমাদের দাস রয়ে গেছি সেটার একটা উদাহরণ হচ্ছে ওদের সব কিছুকে স্মার্টনেসের লক্ষণ ভাবা। এই যে ফর্সা মেয়েদের প্রতি আমাদের একটা আকর্ষণ, এটার কারণ কিন্তু সাদা চামড়াদের প্রভু ভাবা। আমরা সবাই হয়তো বা জানি যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কী ভয়ানক ভাবে শোষণ করে আমাদের শেষ করে দিয়ে গেছে।এই যে এখন বলা হয় আমরা একটা উন্নয়নশীল দেশ আর ওরা হচ্ছে উন্নত দেশ, ওরা উন্নত হলোটা কিভাবে?একদম সহজ বাংলায় উত্তরটা হবে, আমাদের সম্পদ চুরি করে। অথচ আফসোস, আজ ব্রিটিশদের মতো করে ইংরেজিতে কথা বলা,ব্রিটিশ কারিকুলাম ব্যবহার করা, সেখানকার নাগরিক হওয়া আমাদের অনেকেরই স্বপ্ন, জীবনের লক্ষ্য হয়ে গেছে।

তবে আমাকে যদি কেউ বলে যে পশ্চিমা উপনিবেশের এক নম্বর কুফল কী যেটার দায় আমরা আজো বহন করে চলেছি, আমি এক কথায় বলবো আরবী আমাদের প্রাথমিক ভাষা হিসেবে হারিয়ে যাওয়া। আমি যখন IIUM এ পড়তাম, তখন আমার দুইজন ক্লাসমেট ছিল মৌরিতানিয়ার। ওরা ইংরেজীতে বেশ দুর্বল ছিলো, যেটা ছিলো আমার কাছে অবাক করা বিষয়। জিজ্ঞেস করলাম যে তোমরা ইংরেজী শিখো না? ওরা জানালো যে ওদের ভাষা আরবী কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা বা সেকেন্ডে ল্যাংগুয়েজ ফ্রেঞ্চ। কারণ হচ্ছে মৌরিতানিয়া ছিল ফ্রান্সের একটা কলোনী। তখন আমার হঠাত মনে হলো যে আরে আমাদের সেকেন্ডে ল্যাংগুয়েজ তো ইংরেজি কারণ আমরা ব্রিটিশদের কলোনি ছিলাম।অর্থাৎ পশ্চিমারা যখন যেখানে কলোনী স্থাপন করেছে তখন তারা সেখানে তাদের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন অবশ্যই এটা দোষের কিছু না কারণ একই কাজ মুসলিমরাও

করেছে।আপনারা দেখবেন মিশরে যখন পপটিক খ্রিস্টানরা ছিল তখন ওদের ভাষা আরবী ছিল না।কিন্তু মুসলিমদের আওতায় আসার পর মিসরের ভাষা হয় আরবী। দৈনন্দিন জীবনের ভাষা এবং কুরআনের ভাষা একই হওয়াটা যে কী পরিমাণ দরকার সেটা মনে হয় বলে বুঝানো সম্ভব না। এই যে আমাদের নামায আমাদের জীবনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না, আমরা ইসলামের ব্যাপারে যে যা বলে তাই হা করে গিলি, কারণ আমরা আরবী বুঝি না। বছর দুয়েক আগে রামাদ্বানে তারাবীহ পড়ার সময়ে সূরা ফুরক্বানের ৩০ নং আয়াত তিলাওয়াত করা হচ্ছিল যেটার অর্থ হচ্ছে- "হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বর্জন করেছে।"

আমি যেহেতু এই আয়াতটার সাথে পরিচিত, তাই শুনেই মানে বুঝেছিলাম এবং আমার বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠেছিলো আচ্ছা আমি কি এদের মাঝে পড়ি যাদের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিযোগের তীর তুলবেন?

এই আয়াতটা যদি বাংলায় বলা হত তাহলে একটু হলেও তো মনে হয় আমাদের মাঝে প্রভাব পড়তো, তাই না? আমরা কুরআন এর সাথে সংযোগ একেবারেই হারিয়ে ফেলেছি, শুধুমাত্র এর ভাষাটা না জানার কারণে। এবং তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নাই।

কুরআনের অনুবাদ পড়লে কখনোই মূল ভাবটা বোঝা যায় না এটা আমাদের ব্রেনে শক্ত করে গেঁথে নেয়া দরকার। মাঝে মাঝে এটা রীতিমত ক্ষতিকর হতে পারে। একটা উদাহরণ দেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন তথাকথিত আমলের বইগুলোতে দেখবেন যে সূরা সাফফাতের ১০০ নং আয়াতকে পুত্র সন্তান লাভের দুআ হিসেবে দেয়া থাকে। যে কোনো বাংলা অনুবাদেও দেখবেন যে এভাবেই আছে- হে আল্লাহ আমাকে একজন সৎ কর্মশীল পুত্র সন্তান দান করো। পড়ে যে কারো মনে হতেই পারে যে আরে ইসলামে তো আসলে ছেলে বাচ্চার কদর বেশী কারণ একজন আল্লাহর নবী এইভাবে ছেলে বাচ্চা চাইছেন! কিন্তু আপনি যদি আরবীটা পড়েন, এখানে সালিহীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেটা পুরুষ বা নারী যে কারো অর্থেই হতে পারে। আমরা যদি সামান্য আরবীটুকুও জানতাম তাহলে এভাবে দুআর হিসাব নিকাশ বদলে যেতো না!

১৯তম পর্ব

এই যে এত কিছু বললাম, সেটার সাথে দাজ্জালের সম্পর্কটা কী আসলে? দাজ্জাল সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে সে একচোখওয়ালা হবে। কিন্তু আমরা যদি হাদীসগুলো ভালোভাবে পড়ি

তাহলে বুঝবো যে মানুষ দাজ্জালের দুটো চোখই থাকবে, তবে তার একটা চোখ নষ্ট থাকবে।অর্থাৎ সে একটা চোখ দিয়ে দেখতে পাবেনা।

আমরা যদি দাজ্জালকে ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা না করে তার ফিতনার প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখবো যে সে আমাদেরকে যে ফিতনা বা পরীক্ষায় ফেলবে সেখানে সে দুটো অপশন দিবে এবং তার মাঝে একটা বেছে নিতে বলবে। এই জায়গাটায় এসে আমার কাছে এতক্ষণ ধরে বলা ইতিহাস খুব জরুরী বলে মনে হয়। আমরা এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার শিকার যেখানে মানুষকে দ্বীন এবং দুনিয়া যে কোনো একটা বেছে নিতে বলা হয়। এই যে জ্ঞান জিনিসটাকে দ্বীনী এবং দুনিয়াবী এইভাবে ভাগ করা হয়, এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব বিপদজনক লাগে। জ্ঞানের মাঝে যে এমন শ্রেণীবিভাগ থাকা উচিত না সেটা মনে হয় এই করোনার ক্রান্তিকাল আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। চিন্তা করুন আজকের সময়ে আমাদের কাদের কাদের দরকার?

১) ভাইরোলোজিস্ট যারা আমাদেরকে জানাবে কিভাবে এই ভাইরাসটা ছড়ায়

২) ডাক্তার যারা আমাদের চিকিৎসা করবে

৩) ফার্মাসিস্ট যারা ভ্যাক্সিন তৈরির চেষ্টা করবে

৪) আলিম যারা আমাদের জানাবে পিপিই পরে কিভাবে অযূ করতে হবে, কেন এই সময়ে মাসজিদে সালাত পড়া যাবে না, জানাযার নামায অল্প কয়েকজন মিলে পড়তে হবে ইত্যাদি

The list can go on and on

এখন স্বাভাবিক সময়ে আমাদের প্র্যাক্টিসিং সার্কেলের কথা চিন্তা করুন, তাদের কেউ যদি ফার্মেসি, কেমিস্ট্রি এগুলো নিয়ে পড়তে চায় তাহলে সেগুলো কি দুনিয়াবী শিক্ষা হিসেবে লেবেল দেয়া হবে না? আমার কাছে এটাই হচ্ছে এক চোখ দিয়ে দেখা। হয় দ্বীন না হয় দুনিয়া। দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞানের মাঝে যখন কোনো ভারসাম্য থাকে না তখন আমরা সামগ্রিক চিত্র দেখতে পাই না, দুইটা বিষয়ের মাঝে যদি বিশাল সংঘর্ষ থাকে, তাহলে সেটা টের পাই না। একটা উদাহরণ দেই- আমরা যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি, তারা স্কুলে সবাই 'ইসলাম ধর্ম' নামে একটা সাব্জেক্ট পড়েছি। মনে করুন যে পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসের পরেই সেই ধর্ম ক্লাস। ফিজিক্স ক্লাসে হয়তো নিউটনের শক্তির অবিনশ্বরতার সূত্র পড়ানো হচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে যে যে শক্তিকে সৃষ্টিও করা যায় না,ধ্বংসও করা যায় না। তারপর তার আগের বা পরেই হয়তো বা ধর্ম ক্লাসে আমরা পড়ছি

কোন কিছুই আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয়। এখন এই পড়াটা যে ফিজিক্স ক্লাসে পড়া বিষয়বস্তুর সাথে সাংঘর্ষিক, সেটা হয়তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি না কারণ দুই ক্লাসেই আমরা শুধু একটা চোখ খুলে রেখেছি, দুই ক্লাসে দুই আলাদা চোখ।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এই এক চোখা নীতির উদাহরণ কী? চারদিকে ভুরিভুরি উদাহরণ। হয়তোবা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী কেউ, দেখবেন কোনোদিনও কুরআনটা হয়তোবা খুলেই দেখে নি। দুনিয়ায় ঈর্ষনীয় সাফল্যের অধিকারী আমার কত ফ্রেণ্ডকে যে আমি ওযূ ভঙ্গের কারণ বলেছি তার ইয়ত্তা নেই। এটা খুব হতাশাজনক একটা বাস্তবতা।

তাহলে কী করা উচিত, এইসব কিছু বাদ দিয়ে শুধু কুরআন হাদীস নিয়ে পড়া উচিত? তথাকথিত দ্বীন শিক্ষা? না, তাহলেও আমরা আদতে এক চোখ দিয়েই দুনিয়াটা দেখবো। আমি একাধিক স্কলারকে চিনি যাদের বর্তমান অর্থ ব্যবস্থার স্বরূপ নিয়ে কোনো আইডিয়া নেই, নিজের অজান্তে আমরা যে সুদের সাথে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি, সেটা বুঝতে পারছি না এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আদ্যপান্ত জানি না বলে।

তাহলে সমাধানটা কী?

কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর।

ভারসাম্য।

ইসলাম একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এখানে দুনিয়া হচ্ছে আখিরাত লাভের Tool. তাই আমি দুনিয়ার অধিকাংশ কাজকেই ইবাদাতে পরিণত করতে পারি যদি নিয়্যতের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারি।

আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দুনিয়ায় জীবন এবং আখিরাতের জীবন,শরীর এবং আত্মা , দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বাস্তবতা এই সবকিছুর মধ্যে দারুণ একটা ভারসাম্য টের পাবো। একটা উদাহরণ দেই।

বলেছিলাম যে নাস্তিকরা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর একটা চেষ্টা চালায়। তাদের যুক্তিকে যদি এক লাইনে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আপনারা দেখবেন নাস্তিকদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যা আমি দেখি না বা আমার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে উপলব্ধি করতে পারিনা সেটার অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করিনা। অন্যদিকে ধর্ম হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস, কোন কিছু না দেখে বিশ্বাস। এটাকে তারা অন্ধত্বের সাথে তুলনা করছে।

আমি বলব যে এখানে একটুখানি চিন্তার অবকাশ আছে। প্রথম কথা হচ্ছে বিজ্ঞান কি আসলেই সবকিছু দেখে বিশ্বাস করে? আর ধর্ম জিনিসটা কি আসলেই অন্ধবিশ্বাস? অবশ্যই আমি কথা বলবো ইসলাম নিয়ে, অন্য ধর্ম আমার কন্সার্ণ না।

এই ব্যাপারটি আমরা বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো আজকের করোনাকালের প্রেক্ষিতে। এই করোনা নিশ্চয়ই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা! মানবজাতি আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারছে না, ভাইরাসটা ক্রমাগত রূপ বদলাচ্ছে, সেটার সাথে পেরে উঠছে না। নতুন নতুন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, এখন আবার বের হচ্ছে যে উপসর্গবিহীন মানুষ থাকতে পারে। কিভাবে ছড়ায় আর কিভাবে ছড়ায় না সেটা নিয়ে খালি পরস্পরবিরোধী তথ্য বের হচ্ছে। WHO একবার বলল যে মৃতদেহ থেকে ছড়ায়। এখন আবার বলছে যে মৃতদেহ থেকে ছড়ায় না।

এত জটিল করেও বলার কিছু নেই আসলে। বিজ্ঞানই আমাদের জানাচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার কথা। ছোটবেলার বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছি মানুষের শ্রাব্যতা, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদির সীমার কথা। মানুষ শুধু আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা রেঞ্জের মাঝে হলেই সেটাকে দেখতে পায়, বা শুনতে পায়। আমরা সবাই আল্ট্রাসাউন্ডের সাথে পরিচিত।আল্ট্রাসাউন্ড কী? এটা আমাদের শ্রাব্যতার ঊর্ধ্বসীমার বাইরের একটা শব্দ। তাই যখন আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় তখন সেটা শুনতে পাইনা। তার মানে কি আল্ট্রাসাউন্ড নেই? আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে কিছু শুনতে বা দেখতে পাই না মানে যে তার অস্তিত্বই নেই এই যুক্তিটাই একটা খোঁড়া যুক্তি।

আচ্ছা বিজ্ঞান কি সবসময় সবকিছু ‘দেখে’ তারপর সেটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে? ফিরে আসছি আবার করোনা সংক্রান্ত উদাহরণ এ। এই যে আজকাল করোনা টেস্ট করা হচ্ছে, এটা কিভাবে করা হয়? এই টেস্টিং নিঃসন্দেহে নাস্তিকদের কাছে ‘বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির’ উদাহরণ। আচ্ছা এখানে কি মানুষের শরীর থেকে স্যাম্পল নিয়ে ‘দেখা’ হয় যে ভাইরাসটা তার শরীরে আছে নাকি? এমন কি কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যেটা বলবে কোভিড আমার শরীরে শা করে ঢুকলো বা শা করে বের হয়ে গেল?

করোনা টেস্টের আসলে দুই ধরণের উপায় আছে- Direct আর Indirect পদ্ধতি। Direct বা Real time RT-PCR পদ্ধতিতে রোগীর শরীর থেকে স্যাম্পল (কফ বা নাকের সোয়াব) নেয়া হয়। এখন কোভিড ভাইরাসে শুধু RNA থাকে। তাই স্যাম্পল থেকে একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু RNA গুলো আলাদা করা হয়। তারপর ‘Reverse transcription’ পদ্ধতিতে RNA

কে নির্দিষ্ট এনজাইমের মাধ্যমে CDNA তে রূপান্তরিত করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে জিনিসটাকে অসংখ্যবার কপি করা, কারণ সামান্য স্যাম্পলে ভাইরাসের উপস্থিতি বোঝা প্রায় অসম্ভব। DNA কে কপি করা যায়, RNA কে করা যায় না। এই প্রসেসে স্যাম্পলে যদি কোভিড ভাইরাসের নির্দিষ্ট RNA থাকে তাহলে মেশিনে গ্রাফ থেকে যে CT Value পাওয়া যায় সেটা অনেক বেশী হয়। সেই CT Value আবার একটা সমীকরণে বসিয়ে তারপর উপসংহারে আসা হয়।

আর Indirect পদ্ধতিতে শরীরে এন্টিবডির পরিমাণ চেক করা হয়। এক্ষেত্রে যুক্তিটা হচ্ছে যে শরীরে ভাইরাস ঢুকলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ সিস্টেম এন্টিবডির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।

আমরা যদি একটু সুচারুভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে দুইটা পদ্ধতিতেই একটা বিষয় কমন- আমরা সরাসরি কোভিড ভাইরাসের উপস্থিতি দেখছি না, অন্য কোনো একটি ইঙ্গিত/ নির্দেশক দেখছি, যেটা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে করোনা পজিটিভ।

আচ্ছা কুরআন যখন আমাদেরকে পরকালের অস্তিত্বের ব্যাপারে বিশ্বাস করতে বলে, তখন সেটা কেন করতে বলে? এটা কি আমাদেরকে কোনো যুক্তি দেখায়? নাকি আল্লাহ বলেন আমি বলেছি, তাই বিশ্বাস করতে হবে ব্যাস! আমরা কি আদৌ জানি আল্লাহ কিভাবে ব্যাপারটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করে?

২০তম পর্ব

কথা বলছিলাম দেখে ও না দেখে বিশ্বাসের ব্যাপারে। আমাদের কারো যখন করোনা টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ আসে, তখন আমাদের শরীরে করোনা ঢুকেছে কী ঢুকে নাই, সেটা না দেখেই আমরা টেস্টের রেজাল্টকে বিশ্বাস করি। যারা টেস্টটা করে, তারাও করোনা ভাইরাসটা স্যাম্পলের মধ্যে দেখে ব্যাপারটা এমন না। আমরা প্রক্রিয়াটাকে ৪-৫ লাইনে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেটা আদতে খুবই সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল। আমাদের দেশে টেস্ট কম হওয়ার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও আছে অবকাঠামোগত ও দক্ষ মানব সম্পদের অভাবজনিত সীমাবদ্ধতা। তাই দেখা যাচ্ছে যে এক জায়গায় টেস্ট পজিটিভ আসছে, আরেক জায়গায় হয়তো নেগেটিভ। এটাও আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। মেশিনে একটু কোথাও ভুল হলেই রেজাল্ট ভুল আসবে। যে রেজাল্ট আসছে সেটাও তো শতভাগ Accurate তা বলা যাবে না। যারা হাতে কলমে কাজটা করছেন তারা এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে এখানে আসলে সম্ভাবনা বা Probability নিয়ে কাজ করা হয়। ব্যাপারগুলো এত Delicate যে শতভাগ নিশ্চিন্ততার সাথে কিছুই বলা সম্ভব না।

Indirect Method এর ক্ষেত্রে তো এটা আরো বেশী প্রযোজ্য, কারণ শরীরের এন্টিবডি করোনার সংক্রমণ ছাড়াও অন্য অনেক কারণে বাড়তে পারে বা করোনা ভালো হয়ে যাওয়ার পরও বাড়া অবস্থাতেই থাকতে পারে। সেজন্যই Indirect Method গুলোতে পাওয়া রেজাল্টের উপর ভরসা করা যায় কম, এগুলোর ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমোদিত না।

তাহলে আমরা কী বুঝলাম? তথাকথিত সাইন্টিক মেথডগুলোতে আমরা 'দেখা' জিনিসের উপর ভিত্তি করে 'না দেখা' জিনিসের ব্যাপারে উপসংহারে পৌঁছাই।

এটা একটা বৈপ্লবিক উপলব্ধি যদি আমরা চিন্তা করি। কারণ আমরা যদি কুরআন পড়ি, তাহলে দেখবো যে কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ আমাদেরকে এভাবেই আল্লাহ, পরকাল এসবের অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে বলেছেন। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে ইনশাল্লাহ।

পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ কুরআনে মৃত ভূমি জীবিত করার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন-

তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা উত্থিত হবে। (৩০ঃ১৯)

আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়।এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। (৫০ঃ৯-১১)

অর্থ্যাত আমরা মৃত ভূমিকে জীবিত হতে 'দেখছি', সেখান থেকে পরকালে মানুষের পুনরুজ্জিবীত হওয়ার ঘটনা, যেটা এখনো অদেখা, সেটা যে হবেই এব্যাপারে উপসংহারে পৌঁছাবো। এভাবে আল্লাহ বারবার সৃষ্টিজগতের নানা নিদর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে বলছেন। যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, তারা ঠিকই বুঝতে পারে যে এগুলো অনর্থক সৃষ্টি হতে পারে না। এগুলো থেকে তারা আল্লাহর ব্যাপারে সঠিক ধারণায় পৌঁছায়, যাদের কথা আল্লাহ সূরা আলে ইমরানে বলছেন-

নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে।যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (৩ঃ১৯০-১৯১)

এইভাবে চিন্তা করলে পরকালের ব্যাপারটা এতটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথাই আল্লাহ বলছেন এভাবে-

যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখনও কি নতুন ভাবে সৃজিত হব? (১৩ঃ০৫)

এই যে 'দেখা' জিনিসের ব্যাপারে জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অদেখা জিনিসের ব্যাপারে ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস আনার প্রক্রিয়া, এটাকে সূরা তাকাসুরে বলা হচ্ছে 'ইলমাল ইয়াক্বীন'। আর একদম চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখার পরে যে ইয়াক্বীন আসে, সেটাকে বলা হচ্ছে 'আইনাল ইয়াক্বীন'। আমরা যদি 'ইলমাল ইয়াক্বীন' এর ভিত্তিতে দুনিয়াতে আমল করি, তাহলে পরকালে সাফল্য পাবো ইনশাল্লাহ। আর পরকালে গিয়ে যখন জান্নাত, জাহান্নাম স্বচোক্ষে দেখবো, তখন ইয়াক্বীন করে লাভ নাই। এটার কথাই আল্লাহ সূরা সাজদাতে বলছেন-

যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (৩২ঃ১২)

আসলে আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অস্তিত্ব তার সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে না পাই, তাহলে সেই আপাত সুস্থ দৃষ্টিশক্তি আসলে অর্থহীণ। পুনরুত্থানের সময়ে সে তার প্রকৃত অবস্থায় উত্থিত হবে-

যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। (২০ঃ১২৫)

আমরা এসব কথা কোন প্রেক্ষিতে বলছিলাম মনে আছে? বলছিলাম দাজ্জাল কানা, আল্লাহ কানা নন। এখন কী বুঝতে পারছি কেন? দাজ্জাল মানুষকে জীবনের একটা দিকে ফোকাস করাবে বা করাতে চাইবে- শরীর/ এই দুনিয়া/ এই জীবন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা একচোখ বিশিষ্ট না বরং তিনি এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।তিনি চান আমরা যেন দুটো জীবনের মধ্যে ভারসাম্য করি। আমাদের শিখাচ্ছেন যে আমরা যদি এই দুনিয়ার বিষয়াদি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে পরকালের ব্যাপারে বুঝবো ইনশাল্লাহ। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে বিজ্ঞান ও ইসলামের মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই, থাকতে পারে না। আল্লাহর মহিমার ব্যাপারে আমরা আরো মুগ্ধ হবো যখন এইসব সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবো যেমনটা আল্লাহ সূরা আলি ইমরানের আয়াতটাতে বলেছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে ভারসাম্য বজায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আমীন।

২১তম পর্ব

আমরা মুসা আলাইহিস সালাম এবং খিদির আলাইহিস সালামের কাহিনীর আদ্যপান্ত বিশ্লেষণে অনেক সময় ব্যয় করেছি মূলত ‘দাজ্জালের এক চোখ নষ্ট থাকবে’ এটার স্বরূপ বোঝার জন্য। আজকে থেকে আমরা চতুর্থ তথা শেষ কাহিনী মানে যুলকারনাইনের কাহিনী সম্পর্কে জানবো ইনশাল্লাহ। আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছি যে কুরআন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদেরকে কোনো ঘটনার সময়, স্থান না ব্যক্তির নাম জানায় না, সবসময় ফোকাস করে ঐ ঘটনা থেকে কী শেখার আছে সেটার উপর। তাই কুরআন যুলকারনাইনের ব্যাপারে যা যা জানায় না-

১) উনি কে ছিলেন

২) কোন যুগে ছিলেন

৩) কোন দেশে ছিলেন

৪) তার এহেন নামকরণের হেতু।

তাহলে কুরআন থেকে আমরা ওনার ব্যাপারে কী জানতে পারি?

১) একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন যিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দেশসমূহ জয় করেছিলেন। এটা করার জন্য সেই যুগে যা যা দরকার ছিলো সবই তাকে দেয়া হয়েছিল।

২) তিনি এসব দেশে সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কুরআন প্রথমে তার পশ্চিমের যাত্রা বর্ণনা করছে (আয়াত নং ৮৬-৮৮) যেখানে উনি এক সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হন। তার সামনে দুইটা রাস্তা খোলে ছিলো-হয় তিনি তাদেরকে অত্যাচার করতে পারতেন অথবা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। এটাই হচ্ছে ক্ষমতার ফিতনা যেটাতে উনি জিতে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন যারা সীমালঙ্ঘন করবে শুধু তাদেরকেই শাস্তি দেয়া হবে, যারা এমন কিছু করবে না তাদের ব্যাপারে সহজতা অবলম্বন করা হবে। এরপর তিনি পূর্ব দিকে যাত্রা করেন, সেখানে এমন সম্প্রদায়ের দেখা পান যাদের সূর্যতাপের থেকে আড়ালের কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। ব্যাস এইটুকুই, আর কোনো বিস্তারিত আমরা পাচ্ছি না। এরপর তিনি তৃতীয়বারের মতো একটি পথ ধরেন এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা জায়গায় পৌঁছান। সেখানকার অধিবাসীরা ইয়াজুজ মাজুজের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তারা অনুরোধ করলো যুলকারনাইন যেনো তাদের ও ইয়াজুজ মাজুজের মাঝখানে একটা দেয়াল নির্মাণ করে দেন। তিনি তাদের সহায়তা নিয়ে সেটা করে দেন। প্রাচীরটা এমন ছিলো যে ইয়াজুজ-মাজুজ সেটার উপর আরোহন করতে পারলো না এবং সেটা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না। কিন্তু তারা ওই প্রাচীরটা ভাঙার চেষ্টা করে আসছে।সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি রাসূল (সঃ) এর সময় তারা সেটাতে একটা গোল ফুটো করতে সক্ষম হয়।কেয়ামতের সময় অর্থাৎ যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবে তখন আল্লাহরই ইচ্ছায় ওরা সেই প্রাচীরটা পুরোপুরি ভাঙতে পারবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজ পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

এখন এই ইয়াজুজ-মাজুজ কারা? আমরা একদম শুরুর দিকের পর্বগুলোতে বলেছিলাম যে অনেকেই দাজ্জালের আগমন, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে একধরণের উন্মাদনায় ভুগেন, তাদের কাছে ইয়াজুজ-মাজুজ একটা প্রিয় টপিক। এই ইয়াজুজ-মাজুজ কারা সেটা চিহ্নিত করতে গিয়ে তাদের উৎসাহের কমতি নেই। সেদিন একটা লেখা পড়লাম যে করোনা ভাইরাস নাকি ইয়াজুজ-মাজুজ! আমার এমন হাসি পেয়েছিলো! কারণ এটা থেকে বোঝা যায় যে কিয়ামতের পূর্বে কী হবে সেটার ঘটনা ক্রম আমরা কিছুই জানি না। সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি-

১) প্রথমে ইমাম মাহদী আসবে।

২) তারপর দাজ্জাল আসবে।

৩) ইমাম মাহদীর সাথে দাজ্জালের যুদ্ধ হবে কিন্তু তিনি দাজ্জালকে হত্যা করতে পারবেন না।

৪) এরপর ঈসা (আঃ) আসবেন এবং তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

৫) তারপরে অর্থাৎ দাজ্জালের হত্যার পর ইয়াজুজ-মাজুজ আসবে যাদেরকে ঈসা আলাইহিস সালামও হত্যা করতে পারবেন না।

আসুন এই সংক্রান্ত হাদীসটার অংশবিশেষের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নেই-

.....দাজ্জাল এরূপ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় আল্লাহ মাসিহ ইব্ন মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন, তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ফেরেশতাদের ডানার ওপর তার দু'হাত রেখে। যখন তিনি মাথা নিচু করবেন (বৃষ্টির ন্যায়) পানি টপকাবে, যখন তিনি মাথা উঁচু করবেন মুক্তোর ন্যায় শ্বেত পাথর পড়বে, (অর্থাৎ পরিষ্কার পানি)। কোন কাফের এর পক্ষে সম্ভব হবে না তার শ্বাসের গন্ধ পাবে আর বেচে থাকবে, তার শ্বাস সেখানে যাবে যেখানে তার দৃষ্টি পৌঁছবে। তিনি তাকে সন্ধান করবেন অবশেষে 'লুদ্দ' নামক দরজার নিকট তাকে পাবেন, অতঃপর তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম এক কওমের নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জাল থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তিনি তাদের চেহারায় হাত ভুলিয়ে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্তবা সম্পর্কে তাদেরকে বলবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তার নিকট ওহি করবেন, আমি আমার এমন বান্দাদের বের করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার সাধ্য কারো নেই, অতএব তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে তুরে আশ্রয় গ্রহণ কর, আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রেরণ করবেন, তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ছুটে আসবে..... (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)

আমি একদম শুরুর দিকের পর্বগুলোতে দাজ্জাল নিয়ে অহেতুক মাতামাতি করার ব্যাপারে আমার অবস্থান স্পষ্ট করেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে এ সংক্রান্ত আলোচনা আমাদের মাঝে এক ধরণের হতাশা সৃষ্টি করে ও কর্মোদ্দীপনা কমিয়ে দেয়। তারা দেখাতে যায় যে কোনো গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান দাজ্জাল আসার স্টেজ তৈরির জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে/ নিচ্ছে। ব্যাপারটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে বাস্তবতার সাথে সেগুলো একদম খাপে খাপে মিলে যায়। তখন মনে হয় দাজ্জাল তো চলেই এসেছে, এখন আর আমাদের কী করার আছে! আমার এক ছাত্রী এ সংক্রান্ত একটা সিরিজ

দেখার পর নামায পড়াই ছেড়ে দিয়েছিলো। এই যে মনোবল ভেঙ্গে যাওয়া, অবস্থা পরিবর্তনে নিজের দায়িত্ব পালনে অনীহা সৃষ্টি হওয়া, আসুন এটার একটা ঐতিহাসিক উদাহরণ দেখি-

" হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমনের সময় নাসীরউদ্দীন তূসী নামক সেই সময়ের সুফী সম্রাট মংগোলিয়নদের চোখের ভাব দেখে ও তাদের দেহের বৈশিষ্ট লক্ষ্য করে বলে দেন এরাই হলো হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ মাজুজ। আব্বাসীয় সেনাবাহিনীর মনোবল এতে এমন ভাবে ভেঙ্গে যায় যে, মংগোলীয় বাহিনীর সামনে তারা দাঁড়াতে পারেনি, কিংবা দাঁড়াতে চায়ওনি। অথচ এর কয়েক বছর পর এদের একটা বাহিনী সুলতান কুতজ এর কাছে পরাজিত হয়। এবং ইতিহাস বিস্ময় নেত্রে তাকায়ে দেখে যে এই মংগলীয়রা বিজয়ী হয়েও বিজিতদের ধর্ম ইসলাম কিভাবে দলে দলে গ্রহন করেছে।" [1]

কেউ কি বলতে পারবেন যে এখানে ভুলটা কী ছিলো? এটাতো মিথ্যা না যে সহীহ হাদীসে ইয়াজুজ মাজুজদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে (এদের মুখগুলো হবে চওড়া এবং চোখগুলো হবে ছোট ছোট।)। তাহলে?

আমাদের বুঝতে হবে যে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে হলে আমাদের এগুলো ব্যাখ্যা করার উসূল সম্পর্কে জানতে হবে। এখানে যে উসূল বা মূলনীতি ভংগ করা হয়েছে সেটা হল হাদীসে যা 'আম' বা সাধারণভাবে বলা হয়েছে সেটাকে 'খাস' বা নির্দিষ্ট করে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে মনে হবে যে কুরআন বা সুন্নাহতে যেন তথ্যটা ঠিক এভাবেই বলা আছে।একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে-

একটা হাদীসে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইরাকে এমন অবস্থা হবে যে, এখানে খাওয়ার জন্য একদিন একখানা রুটিও মেলবেনা, কিংবা কারো হাতে কোন পয়সাও পাওয়া যাবেনা (মুসলিম)।

---

[1] এই তথ্যটা আমি নিয়েছি 'কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের দলীল গুলো বুঝার মূল নীতি' শিরোনামে শ্রদ্ধেয় আব্দুস সালাম আজাদীর (https://www.facebook.com/drsazadi) একটি লেখা থেকে, যেটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো আমরা আমাদের পোস্টে একাধিকবার উল্লেখ করবো ইনশাল্লাহ।

এই হাদীস কে মিলাতে যেয়ে অনেকে ভাবতেন এখানে ১৯৯০ সালে ইরাকের অর্থনৈতিক অবরোধের সময় আসা দূর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইরাকে এমন ঘটনা তাতারদের সময়েও হয়েছে।

অর্থ্যাৎ এটা ভাবা যাবে না যে হাদীসে তাতারদের আক্রমণ বা ১৯৯০ এর এই অবরোধের কথাই বলা হয়েছে!

দাজ্জাল, কিয়ামতের আলামত বা এসংক্রান্ত বিষয় বুঝতে গেলে এটা সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা মূলনীতি যেটা আমাদের ব্রেনের কোষে কোষে গেঁথে নেয়া দরকার।

২২তম পর্ব[2]

দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজ বা কিয়ামতের আলামত, এই সংক্রান্ত যে কোনো ধরণের টপিকে যে কোনো বক্তব্য আজকাল খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। আমি ইচ্ছা করেই কোনো বক্তার নাম উল্লেখ করছি না, তবে আমি এই সিরিজের প্রথম দিকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের আগের আমার অবস্থার কথা বলেছি, তখন এধরণের লেখা খুবই উত্তেজনাকর লাগে। এধরণের যে কোনো বক্তব্য একটু খেয়াল করে শুনলেই আমরা বুঝবো যে সেগুলোতে 'আম' ব্যাপারগুলোকে 'খাস' বা নির্দিষ্ট করে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন কুরআন হাদীসে এভাবেই বলা হয়েছে। এটা একটা বড় ভুল। যেমন ধরেন কেউ দ্ব্যর্থহীণভাবে প্রচার করেন যে বর্তমান ইসরাঈলের অধিবাসীরা হচ্ছে ইয়াজুজ মাজুজ। কেন? কারণ ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিন দখল করার পর তারা গ্যালিলিও নদীতে কিছু কৃত্রিম পরিবর্তন আনে ফলে বর্তমানে সেটার পানি আসলেই শুকিয়ে যাচ্ছে, যেটার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে-

অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এমন এক সম্প্রদায়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত বুলাবেন এবং জান্নাতে

[2] এই পর্বের অধিকাংশ কন্টেন্ট আগের পর্বে উল্লেখিত আবদুস সালাম আজাদীর পোস্ট থেকে নেয়া হয়েছে, আল্লাহ উনাকে উত্তম প্রতিদান দিন

তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। তাদের এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহী পাঠাবেন, হে ঈসা! আমি আমার এমন বান্দাদের পাঠাবো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নাই। অতএব তুমি আমার বান্দাদের তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলোঃ "তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে" (সূরা আম্বিয়াঃ ৯৬)। ***এদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া হ্রদ অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দল এখান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয় কোন কালে এতে পানি ছিলো। (মুসলিম ২৯৩৭)***

এখন আপনারাই বলুন, এই হাদীস পড়ে আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ইসরাঈলের অধিবাসীরাই ইয়াজুজ মাজুজ?

দাজ্জাল, ইমাম মাহদী, কিয়ামতের লক্ষণ- এ সংক্রান্ত আলোচনাগুলোতে দাজ্জালকে অসীম শক্তিধারী হিসেবে দেখানো হয়, ফলে হতাশা জাগে এটা আমি বারবার বলছি। আমরা যেন ভুলেই যাই যে দাজ্জাল তো আল্লাহর এক অধম বান্দা বৈ কিছু না। তবে এইভাবে নির্দিষ্ট করে আলোচনার আরো একটা বিশাল অসুবিধা আছে। এগুলো যখন ঠিক হয় না, তখন যারা এধরণের ধারণাকে একদম সত্যি হিসেবে বিশ্বাস করে বসেন, তাদের মাঝে কুরআন ও হাদীস অস্বীকার করার প্রবণতা আসতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে একটা ভয়ংকর ব্যাপার।

কিয়ামতের আগে কিছু নমুনা বা চিহ্ন প্রকাশ পাবে, যেগুলার কথা কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বলে দেয়া হয়েছে। আমরা অবশ্যই এগুলোর উপর বিশ্বাস করবো, সেটা আমাদের ঈমানের দাবী, অস্বীকার করা কুফরী। তবে এগুলো মানতে বা বুঝতে গিয়ে আমাদের যেন ভুল না হয় সেজন্য আমাদের কিছু মূলনীতি মনে রাখা উচিৎ এবং সেগুলো মেনে চলা উচিৎ-

- কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত দলীলগুলোকে বর্তমান সময়ের ঘটনা বা দুর্ঘটনার সাথে মিলাতে যেয়ে এমন বিশ্বাস নিয়ে আসা যাবেনা যে এইটাই কুরআন ও হাদীসের বলা জিনিস বা বিষয়।
- কেউ যদি এধরণের কোনো দাবীও করেন, তাহলে তার উচিত হচ্ছে
    - ✓ সেটা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা
    - ✓ স্বীকার করা যে এটা স্রেফ 'ধারণা' র চেয়ে বেশী কিছু নয় (যেমন ডঃ ইসরার ধারণা করতেন চীন ও রাশিয়ার সখ্যতাই বুঝায় ইয়াজুজ মাজুজ ওরাই হবে। এই দৃষ্টিভংগীকে 'ধারণার' চেয়ে বেশী বলা যাবেনা)
    - ✓ অন্যকে সেটা মানতে বাধ্য না করা।

দাজ্জাল ও ইমাম মাহদী সম্পর্কিত বক্তব্য যারা দেন তাদের মাঝে কেউ কেউ এমনভাবে সাল, তারিখ এসব উল্লেখ করেন যে কবে কী হবে, ব্যাপারটা একদম ভবিষ্যৎবাণী পর্যায়ে চলে যায়। এটা যে সর্বৈতভাবে নিষিদ্ধ সেটাতো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিয়ামতের আলামতসমূহের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?

- কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত হাদীস গুলো সবই প্রকৃত অর্থেই গ্রহন করতে হবে। কোনটাই রূপক অর্থে নয়। রূপক অর্থে যদি হত তাহলে আমাদের নবী (সা) বলে যেতেন না যে ইমাম মাহদী তার বংশের এবং তার নামের হবে – এই কথা তিনি বলে যেতেন না। দাব্বাতুল আরদের বর্ণনা বলে যেতেন না। ইয়াজুজ মাজুজের শারীরিক বর্ণনা বলতেন না।
- কিয়ামতের আলামত প্রকাশ হওয়ার অর্থ এই নয় যে এই গুলো হওয়ার মাত্র কিছুদিন পরেই কিয়ামত শুরু হবে। আসলে কিয়ামতের আলামত তিন ধরণেরঃ প্রথমতঃ যা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন আমাদের নবী (স) এর জন্ম ও ইন্তেকাল। দ্বিতীয়তঃ যা এখনো দুই একটা প্রকাশ পাচ্ছে যেমন ব্যাভিচার বেড়ে যাওয়া, বাজনার সামগ্রী অঢেল হওয়া। তৃতীয়তঃ যা এখনো প্রকাশ পায়নি, যেমন ইমাম মাহদী, ঈসা (আ)।

কাজেই এই আলামত বেড়ে গেলো বলে আমল বাড়াতে হবে, ওই গুলো কমানোর চেষ্টা করতে হবে, এবং ছোট আলামত গুলো বন্ধ হওয়ার পথ বের করতে হবে। বড় আলামত বের হলে আল্লাহর হুকুমেই নেতিবাচকগুলোকে মুকাবিলা করতে হবে আর ইতিবাচকগুলোকে হলে সাহায্য করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই হতাশাবাদী মানসিকতা গ্রহণ করা যাবে না, চেষ্টা করে যেতে হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আমরা জবাবদিহি করবো শুধুই আমাদের চেষ্টার জন্য, চেষ্টার ফলের জন্য নয়। এটাই সম্ভবত একদম আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে যাওয়া উচিৎ। তবে হ্যাঁ, আমি দাজ্জালের আগমনের স্টেজ তৈরি করা সংক্রান্ত যেসব মুভি আগে দেখেছি, সেখান থেকে একটা জিনিস আমি শিখেছি-বর্তমান বিনোদন জগত, কার্টুন এগুলোর মাধ্যমে কিভাবে আমাদের মাঝে ডিসেনসেটাইজেশন করা হয়, কীভাবে জ্বিনদের ব্যাপারে বাচ্চাদের মনে হাস্যকর ধারণা তৈরি করা হয়,কিভাবে আগুন, নবী-রাসুল,আল্লাহকে নিয়ে ফান করা হয়, কিছু রক মেটাল ব্যান্ডের সদস্যরা যে আসলেই শয়তানের উপাসনা করে এবং তাদের গানের/ মিউজিক ভিডিওর মাধ্যমে দর্শকদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে ইত্যাদি । অধিকাংশ কার্টুনে একটা কেন্দ্রীয় চরিত্র বা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারো এক চোখ নষ্ট/ ঢাকা থাকে এভাবে এক চোখ নষ্ট কাউকে সেলিব্রেটি হিসেবে উপস্থাপন করার আইডিয়াটা আমাকে বাধ্য করেছে যেন আমি ইলমাকে বড় করার সময় ওর হাতে কোনো ম্যাটেরিয়ালই নিজে না দেখে তুলে না দেই। শত ব্যস্ততার মাঝেও আমি যেন এটা মেইনটেইন করতে পারি, এটা দুআ নিজের জন্য, সাথে সকল মা-বাবার জন্য।

এই যে এত কিছু বললাম, সেগুলোর সারমর্ম কী? বিভিন্ন হাদীসে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে কিয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে, তখন তিনি উত্তরে যেটা বলেছেন সেটা-

“তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো?”

আল্লাহ আমাদেরকে প্রোডাক্টিভ মুসলিমের জীবন যাপন করার তৌফিক্ব দিন। সূরা কাহফের চারটি গল্পের সারাংশ বলা আমাদের এখানেই শেষ, আগামী পর্ব থেকে আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ কিভাবে প্রথম দশ আয়াত আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন দিচ্ছে।

বোনাস পর্ব-১ (অপ্রকাশিত)

আজকে থেকে আমরা প্রথম দশ আয়াত নিয়ে আলোচনা শুরু করবো ইনশাল্লাহ। আমাদের মূল ফোকাস থাকবে কিভাবে এই আয়াতগুলো আমাদের 'one eyedness' থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়। তবে তার আগে কিছু কথা বলা নিতে চাই।

পশ্চিমা উপনিবেশবাদের কুফল নিয়ে কথা বলার সময় আমি বলেছিলাম যে মুসলিম হিসেবে আমাদের মেরুদণ্ডটাই যেন ভেঙ্গে গিয়েছে আরবী ভাষা না বোঝার কারণে। তাই এই দশ আয়াত নিয়ে আদ্যপান্ত বিশ্লেষণের সময় আমার আরো একটা উদ্দেশ্য থাকবে এটা বোঝানো যে আরবী না জানার কারণে আমরা কিভাবে কুরআনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমরা যারা জীবনে টুকটাক আরবী শেখার চেষ্টা চালিয়েছি তারা সবাই হয়তো এক বাক্যে স্বীকার করবো যে আরবী বেশ কঠিন একটা ভাষা। নিজের অজান্তেই হয়তো আমাদের মনে কষ্ট জেগেছে যে কেন আল্লাহ এমন কঠিন একটা ভাষায় কুরআন নাযিল করতে গেলেন। আমি অস্বীকার করবো না যে আমারও একসময় এমন মনে হত। তারপর আরবী ভাষা শিখতে গিয়েই আমি কারণটা কিছুটা বুঝতে পেরেছি। আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে আরবী অত্যন্ত সমৃদ্ধ (Rich) একটা ভাষা। এখানে একেকটা শব্দকে অসংখ্য দিক থেকে মানে Multi-dimensional way তে বিশ্লেষণ করা যায়। যে গ্রন্থ হাজার হাজার বছর ধরে বিলিয়নের উপর মানুষের হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট হবে তা কি এমন হওয়া উচিৎ না যে তার আবেদন কখনো ফুরাবে না? যারা কুরআন গভীরভাবে পড়েছেন তারা সবসময় এটা অনুভব করেন যে সময়ের সাথে সাথে যেন নতুন নতুন দিক উন্মোচন হয়ে যায়, একেকটা আয়াত জীবনের একেক সময়ে একেকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে যায় তাই কুরআন নিয়ে পড়াশোনা, চিন্তাভাবনা কখনোই যেন শেষ হওয়ার না। আর এটা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে এটার ভাষা আরবী হওয়ার কারণে।

একটা দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে কুরআন এটার Original ভাষায় জানার আগ্রহ নও-মুসলিমদের মাঝে অনেক বেশী আমাদের চেয়ে। আল্লাহ ক্যান আরবীতে নাযিল করলেন কুরআন এসব প্রশ্ন আমাদের মাথাতেই আসে যারা সব কিছু রেডিমেড চাই। এটাতো কমন সেন্স হওয়া উচিৎ ছিলো- যে ভাষাতেই নাযিল করা হোক না কেন অন্য ভাষার অনুসারীদের মনে হবে আহা আমার ভাষায় যদি হত। আসল কথা হল আল্লাহ 'আমাকে' কী বলছেন সেটা জানার আগ্রহ থাকা যেটা আমাদের খুব কম, এটা অনুবাদে কখনো বোঝা সম্ভব না। আমরা IELTS এর স্কোর তোলার জন্য এত কষ্ট

কেন করি? আমরা উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে Real Passionate, তাই না? জাপানিজ, চাইনিজ, টার্কিশ, স্প্যানিশ এসব ভাষাও তো শিখে ফেলি। Passion এর কথা এজন্য বললাম যে আমরা যারা বাঙ্গালী, তাদের জন্য বরং এটা তুলনামূলকভাবে সহজ কারণ আরবী অনেক শব্দ আমাদের ভাষায় চলে এসেছে যা আমরা বাংলা শব্দ ভেবে ব্যবহার করি, আসলে তা আরবী। ইংরেজীতে এমন শব্দ তুলনামূলক কম,তাও পশ্চিমা নও মুসলিমরা ঠিকই আরবী শিখে ফেলে।

যে কথাটা বললাম যে আমাদের ব্যবহার করা অনেক শব্দ আসলে আরবী-এটা চিহ্নিত করতে পারা কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী একটা কৌশল। কেউ উদাহরণ দিতে পারবেন? আগের প্যারাতেই উদাহরণ আছে!

হুম।

দেখুন নাযিল শব্দটা ব্যবহার করেছি আমি যেটা আসলে একটা আরবী শব্দ। সূরা কাহফের ১ম আয়াতেই এটার একটা Derived form আছে। কেউ বলতে পারবেন?

হুম।

আনযালা।

এইটা আরবী ভাষার আরেকটা জাদু। ধাতুমূল বা Root Word টা জানলে অসংখ্য শব্দের অর্থ আন্দাজ করা যায় যেটা ইংরেজীতে একেবারেই হয় না। ইংরেজীতে GRE র জন্য কত হাজার শব্দ মুখস্থ করে না মানুষ? তার ১০ভাগের ১ ভাগ Root Word আরবীতে জানলে কুরআন বোঝা খুব সহজ হয়ে যায়, কুরআনে প্রচুর শব্দের পুনরাবৃত্তি আছে।[3] এজন্যই 50%, 70% কুরআন এইধরণের কোর্সের নাম শোনা যায় যেখানে আসলে অসংখ্যবার কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে এমন শব্দ শেখানো হয়।

তাই আমরা যখন দশ আয়াতের word by word বিশ্লেষণ করবো ইনশাল্লাহ তখন চেষ্টা করবো আমরা অলরেডি জানি এমন শব্দের সাথে সম্পর্ক দেখানোর, তাহলে যাত্রাটা সহজ হবে ইনশাল্লাহ।

[3] http://80percentwords.blogspot.com/ এই ওয়েবসাইটের সবগুলো শব্দ শিখে ফেললে অনেক উপকার হয়।

আমাদের আরো একটা উদ্দেশ্য হবে যে, একটা শব্দের সম্ভাব্য সবগুলো অর্থ জানা এবং দেখানো যে এভাবে আমরা এমন অনেক কিছুর শিক্ষা পেতে পারি, যেটা আপাতদৃষ্টিতে শুধু অনুবাদ পড়লে অজানা থেকে যাবে (কারণ অনুবাদে শুধু একটা অর্থ দেখানো হয়)।

তাহলে শুরু করা যাক?

বোনাস পর্ব-২ (অপ্রকাশিত)

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

১ম আয়াতঃ

“আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আনযালা ‘আলা ‘আবদিহিল্ কিতা-বা ওয়ালাম্ ইয়াজ্ব‘আল্লাহূ ‘ইওয়াজ্বা”

এখানে আমরা একটা একটা করে শব্দের মানে বুঝে নিই।

আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ,
আল্লাযি মানে হল যে, whoever
আনজালা- নাযিল করা
আ'লা- upon, প্রতি
আব্দিহী- মানে তার দাস,
আল কিতাবা- বই (এখানে কুরআনের কথা বলা হচ্ছে।)
ওয়ালাম- strong form of Negation
ইয়াজাআল্লাহু- রাখা
ইওয়াজা- বক্রতা

শব্দগুলোর অর্থ ও তার বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে কুরআনের একটা Literary Style এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই যেটা কখনই অনুবাদে ধরা পড়ে না।
আমি যদি বলি- ‘ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ পড়েছি’, তাহলে সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি বলি- ‘আমি পড়েছি বিবিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে’, তাহলে শুনলেই আমাদের কানে লাগবে, মনে হবে ঘাপলা আছে। আমরা হয়তো বা বক্তার দিকে তাকাবো এটা বোঝার চেষ্টায় যে সে কেন এভাবে বলছে। বা তার কাছে জানতে চাইবো। এখন আমরা আরবী জানি না বলে এভাবে যদি ক্রম ঠিক না থাকে তাহলে সেটা টেরই পাবো না।

যেমন আমরা হয়তো জানিই না যে সূরা ফাতিহার "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন" এই বাক্যতে শব্দের স্বাভাবিক ক্রম ঠিক নেই। আরবি গ্রামার অনুযায়ী এটা হওয়া উচিত ছিল "না'বুদু ইয়্যাকা ওয়া নাসতাঈনা ইয়্যাকা ", কারণ আরবিতে ক্রিয়াপদ সব সময় বাক্যের শুরুতে বসে, এখানে বাংলা কিংবা ইংরেজি গ্রামার এর সাথে তার পার্থক্য। এটা কুরআনের খুব কমন একটা লিটারারি স্টাইল। যখন এ ধরনের পরিবর্তন করা হয় তখন সেটা দ্বারা চারটা বিষয় প্রকাশ হয়-

1) Exclusiveness
2) Enthusiasm
3) Curiosity
4) Emphasis

কুরআনের কোন আয়াতে কোনটা বুঝানো হয়েছে এটা তাফসীরকারকদের একটা কমন আলোচনা। যেমন সূরা ফাতিহাতে এটা দ্বারা Exclusiveness বুঝানো হয়েছে- মানে আমরা শুধুই তোমার ইবাদাত করি, শুধুই তোমার সাহায্য চাই, আর কারো না।

সূরা কাহফে কী বুঝানো হয়েছে? সেটা নিয়ে একেক তাফসীরকারক একেক আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে এখানে Emphasis বোঝানো হয়েছে, এভাবে বলার মাধ্যমে ‘বান্দা এবং

আল্লাহকে' একসাথে রাখা হয়েছে, আর 'কিতাব ও বক্রতা নেই' এটাকে একসাথে রাখা হয়েছে। এভাবে কী বিশেষ অর্থ প্রকাশ পেলো?

সাধারণত আমরা যখন আমাদের পরিচয় দেই আমরা নিজেদের যেই পরিচয়টা দিতে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি সেটা আগে বলি। যেমন, আমি যদি বলি যে "আমি অমুকের মা" তার মাধ্যমে আমি কিন্তু এটাই প্রকাশ করছি যে আমি এই মা পরিচয়টা তে খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি অথবা এই মা পরিচয়টা তে পরিচিত হতে পছন্দ করি।
তাই এখানে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিলের কথা বলা হচ্ছে (যেটা বিশাল সম্মানের ব্যাপার), তখন উনাকে আবদিহী মানে আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক মুহূর্তটার (মিরাজের ঘটনা) কথা বলা হয়েছে, সেখানেও উনাকে আবদিহী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। মানে এটাই উনার জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক পরিচয়।

আমরা যখন কোনো কিছু দাসত্বের কথা বলি বা কাউকে দাস বলি সেটা একটা অসম্মানজনক বা মর্যাদাহানিকর অবস্থা হিসেবে তুলে ধরি। কিন্তু যখন আমরা আল্লাহর দাসত্বের কথা বলি বা আল্লাহর দাস হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিব, তখন এটা শুধু রাসুল বা নবীদের জন্য না, বরং আমাদের সবার জন্য সর্বোচ্চ সম্মানের বিষয়।

কেন?

কারণ আমরা যখন আল্লাহর দাসত্ব ছেঁড়ে দেই, তখন নিজের অজান্তেই অন্য কোনো সৃষ্টি বা প্রবৃত্তির দাস হয়ে যাই।

একটা উদাহরণ দেই।

নারীবাদীরা অনেক সময় বলে থাকেন যে "আমি কি ড্রেস পরবো এটা অন্য কেউ কেন ঠিক করে দিবে?" তারা মেয়েদের পর্দা করার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাসত্ব খুঁজে পান। কিন্তু বাস্তবতা এই যে 'আমি কী পোশাক পরবো এটা আদতে আমি ঠিক করি না, ঠিক করে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি। যখন লম্বা ড্রেস পরার ফ্যাশন আসে তখন লম্বা ড্রেস পরি, যখন ঢিলা ড্রেসের চল আসে, তখন সবাই সেটা পরে। নিজের ইচ্ছামত পরলে আমরা হয়ে যাই 'খ্যাত'। তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে ছেলেদের নারী শরীরের যেই যেই অংশ দেখতে ভালো লাগে, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি সেই জায়গাগুলো উন্মুক্ত করে ড্রেস ডিজাইন করে। তা না হলে আমরা কি কখনো প্রশ্ন করেছি যে কেন মেয়েদের জিন্স স্কিন টাইট হয় আর ছেলেদের টা ঢোলা ঢোলা হয়? সিনেমায় দেখা যায়, নায়িকা নামসর্বস্ব একটা কাপড় পড়ে থাকে আর ছেলেটা খুব ভালোভাবে ড্রেসআপ করে করা থাকে। পশ্চিমা দেশের বীচে গেলে মেয়েরা প্রায় সব কিছু খুলে ফেলে আর ছেলে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট পরে। কেন?

কিন্তু আমরা যখন আল্লাহর দেয়া ড্রেস কোড পরি তখন মনে প্রাণে মেনে নেই যে আল্লাহরই পূর্ণ অধিকার আছে আমরা কী পরবো না পরবো সেটা ঠিক করে দেয়ার। হ্যাঁ এটা সত্যি যে অনেক মেয়েই বাবা কিংবা ভাই কিংবা স্বামী চায় বলেই পর্দা করে। আবার এটাও সত্যি যে অনেক মেয়ে পরিবারের তীব্র বাঁধা উপেক্ষা করে পর্দা করে। আমরা শুধু এক দিকের চিত্রই তুলে ধরি কেন?

মূল কথা হচ্ছে আমরা মুসলিম মেয়েরা যখন আল্লাহর দেয়া ড্রেসকোড মেনে চলি, তখন ফ্যাশন ইন্ডাসট্রির দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করি। আর সেজন্যই এটা এত সম্মানের।

আচ্ছা আমরা কি আমি আল্লাহর আবদ বা দাস এই পরিচয়ে গর্ব বোধ করি? আসুন নিজেকে একটু জিজ্ঞেস করি।

সমাপ্ত (আপাতত)